বাংলাবুক পরিবেশিত

বার্ট্রান্ড রাসেল

অস্তিত্বের সংশয়

অস্তিত্বের সংশয়

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

(Has Man a Future ? গ্রন্থের অনুবাদ)

অনুবাদ

সিদ্দিকুর রহমান

মওরোজ কিতাবিস্তান
ঢাকা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অস্তিত্বের সংশয়
দ্বিতীয় প্রকাশ :
মার্চ, ১৯৮৮

প্রকাশক :
আবদুল কাদির খান
নওরোজ কিতাবিস্তান
৫, বাংলা বাজার,
ঢাকা ১১০০

মুদ্রাকর :
নজরুল ইসলাম মল্লিক
সোহাগ প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স
২/ডি, দারুস্‌সালাম রোড,
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
সমর মজুমদার

মূল্য ৪০·০০ টাকা

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ASTITTER SANGSHAYA (Has Man a Future ?) By Bertrand Russel, Translated by Siddiqur Rahman. published by Nauroze Kitabistan 5, Bangla Bazar, Dhaka 1100.

Price : Taka 40·00.

উৎসর্গ

মার্টিন লুথার কিং-এর
স্মৃতির উদ্দেশে ঃ

দুঃখই যার সম্বল ছিলো
এবং দরিদ্র নিপীড়িত শোষিত
দুঃখীজনের
চোখের জল ভালোবাসার ছোঁয়া
দিয়ে ঢেকে দিতে গিয়ে
যিনি অকালে
ভয়াল মৃত্যুর শিকার হলেন

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অনুবাদকের বক্তব্য

মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিজ্ঞজনের তথা সচেতন শ্রেণীর মানুষ ক্রমশঃই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন। পৃথিবী নতুন কোনো আণবিক যুদ্ধ সামলে উঠতে পারবে কিনা এ হচ্ছে আপাত-অবান্তর প্রশ্ন। সৃষ্টি সূত্রের প্রারম্ভিক অগ্নিকুণ্ড থেকে এ যাবত বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে এবং অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের সমন্বিতরূপ নিয়ে পৃথিবী বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত এসে পেঁৗছেছে। প্রচণ্ড, ভয়াবহ ও বিপুল তার প্রাণশক্তি। মানুষ তার একমাত্র উঁচুশ্রেণীর প্রাণী কিনা অথবা সর্বশেষ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বস্তু কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। বলা সম্ভবও নয়। কিন্তু যে কথা বলা মোটামুটিভাবে সম্ভবপর তা হচ্ছে সৃষ্টি বৈচিত্র্যের কাছে মানুষ তেমন কোনো হিসেব করে দেখার মতো বিষয় নয়। আদিম অবস্থা থেকে মানুষ পার্থিব তথা মহাজাগতিক প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজস্ব অস্তিত্ব নির্ধারণ করেছে। আজো যে এ অবস্থা চলছে না এমন নয়। আজো মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে খড়-কুটোর মতো নিতান্ত অসহায়। কিন্তু এ অসহায় অবস্থা বা স্তর থেকে মুক্ত হওয়ার যে সাধনা, তা না করে কিংবা অংশতঃ সে সাধনায় নিয়োজিত থেকে মানুষ একেবারে অর্বাচীনের মতো নিজস্ব অবস্থান বিলুপ্ত করার এক বিস্ময়কর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর ফলে প্রাকৃতিক নির্মমতার সাথে এসে যুক্ত হয়েছে তার নিজের প্রতি নিজের নিষ্ঠুর আচরণ। এ আচরণকে কেউ হয়তো বিবর্তন ধারার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে মেনে নিতে চাইবেন। ওরা হয়তো এ যুক্তিও ঠেলে দিতে পারেন যে সৃষ্টির মধ্যেই নিজস্ব ধ্বংস প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকে। কথাটি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ধারা সৃজনশীল বৈচিত্র্যের অংশ বিশেষ। প্রকৃতি এভাবে নিত্য-নতুন পথে এগোয় বা এগোতে থাকে। নইলে সৃষ্টি অসার হয়ে যেতো। স্থবিরতায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতো মহাজাগতিক রহস্য ময়তা।

এসব হচ্ছে সৃষ্টির অন্তর্লীণ খেলা। প্রকৃতির অমোঘ পরিচয়। মানুষ এক সময় সহ-অবস্থানের কায়দা-কানুন রপ্ত করতে চেয়েছে। চেয়েছে পাশাপাশি অবস্থানকে দুস্তর করার জন্যে সংহত রূপ দেয়ার

জন্যে। প্রকৃতি সহ-অবস্থানধর্মী পরিবেশকে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছে। এর ফলে মানব জীবন তথা পার্থিব জীবন মোটামুটি সহনশীল অবস্থায় রয়ে গেছে। তারপর একদিন ডিনামাইট আবিষ্কার হলো। পৃথিবীর বুক ছিন্নভিন্ন করে মানুষ তার দিকবিদিক চলাফেরার পথ সহজতর করে নিলো। কিন্তু নিজের সুখের জন্যে যে বিস্ফোরণ প্রক্রিয়ার আশ্রয় সে নিয়েছে তাই একদিন শহর-নগর-জনপদ উড়িয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত হয়ে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ তা চেয়েছিলো কিনা তা গবেষকদের জানার বিষয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ জানে যে ডিনামাইটই একদিন অধিকতর প্রচণ্ড শক্তিতে এবং ভিন্নতর চেহারায় মাটি থেকে আকাশে, আকাশ থেকে মাটিতে নিজস্ব ভয়াল প্রাণশক্তি বিস্তার করে। সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় যেমন একদিকে আশান্বিত হয়েছে তেমনি আরেকদিকে এর ধ্বংসলীলায় হতাশ হয়েছে। বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, নিয়েছে আবেগ---আজ আর তেমন আকর্ষণীয় বক্তব্য নয়। বরং এভাবে বলা যেতে পারে: বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে সেখান থেকে ফেরার পথ প্রায়-অবরুদ্ধ। পরপর দু'টি দ্রুতগামী মোটর গাড়ি পরস্পরের বিপরীত পথ ধরে ধাবিত। পাশাপাশি একটি আরেকটির সাথে এ মুহূর্তে মুখোমুখি সংঘর্ষে হয়তো নিপতিত হল না। কিন্তু এর সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তেই থেকে যাচ্ছে। শুধু সম্ভাবনার কথাইবা বলি কেনো, এ রকম অবস্থার উদ্ভব না হওয়াটাই বরং অস্বাভাবিক ব্যাপার। এ হচ্ছে আধুনিক সভ্যতা।

তবু কোনো সমাজ সচেতন মানুষ বিজ্ঞান বিরোধী নন। আধুনিক জীবনযাত্রা বিজ্ঞানের ওপরে অতি মাত্রায় নির্ভরশীল। বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সব কিছুই অচল। সবকিছুই থেমে যাবে। এবং এ অবস্থাকে একমাত্র অন্ধ ব্যক্তিরাই অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু জটিলতার উৎস তো এখানে নয়, অন্যখানে। আরো গভীরে এর অবস্থান। বিজ্ঞানী ওপেনহাইমার এক সময় বীজগণিতের সাধারণ সূত্র ভুলে গিয়েছিলেন। বিষয়টি বুঝতে পেরে আইনস্টাইনের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠেছিলো। তিনি জানতে পারলেন যে বিশ্বনন্দিত আণবিক বিজ্ঞানী অসহায় অবস্থার চাপে পড়ে অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠেছেন। ওপেনহাইমার যা করতে চেয়েছেন তা করতে পারেননি। তিনি যা করতে চাননি তাকে দিয়ে তা'ই করানো হচ্ছে এবং সর্বত্র এ অবস্থা বিরামহীন গতিতে চলছে। বিজ্ঞান এর নিজস্ব ধ্বংসের তাগিদে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এক ধরনের অবিমৃষ্যকারিতা ; এক ধরনের নিষ্ঠুরতা ও এক ধরনের কুৎসিত ও কূটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক ভেদ-বুদ্ধি, যা কিনা সরল ভাষায় বলা যায়—অমানবিক ষড়যন্ত্র। যে অপার সচেতনতাবোধ মানুষকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্বেষণের দিক নির্দেশনা দিয়েছে, যে শ্রম ও নিষ্ঠা মানুষকে প্রকৃতির মুখোমুখি সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছে এবং যে মানবিক চিন্তাধারাসম্বলিত আত্মশক্তি তাকে বিজ্ঞানের বিজয় পতাকা বয়ে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে আজ সে সবই কেবল জোটনিবদ্ধ মানসিকতার কারণে অসার ও অর্থহীন হয়ে ওঠেছে। এর ফলে আজ সভ্যতা বিপন্ন। অতোটা বিপন্ন যা এর আগে কখনো ঘটেনি। সারা বিশ্ব একটি অস্ত্র গুদামে রূপান্তরিত। যে আণবিক চেইন রিএকশান পৃথিবীর জন্মসূত্রের সাথে গ্রথিত তা আজ অর্বাচীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের হাতে পড়ে মানবজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্তির প্রচেষ্টায় সক্রিয়।

কিউবা সংকটের সময় যখন দুই পরাশক্তি জোটগত মর্যাদা রক্ষা করার প্রশ্নে আণবিক অস্ত্রাগার উন্মুক্ত করে পরস্পরের মুখোমুখি তখন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জন এফ কেনেডি মধ্যরাতের শেষেও নিদ্রাহীন অবস্থায় থেকে জেনারেল ওয়েস্টমুরল্যাণ্ডকে জিজ্ঞেস করেন—'আপনি বলুন Should we go for nuclear deterrent অর্থাৎ আমরা কি আণবিক অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়া উচিত ?' মার্কিন সেনানীর তাৎক্ষণিক জবাব-'ইয়েস স্যার, এ ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।' কেনেডি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে চিৎকার করে বলে ওঠেন—'Do you know gentleman, that within 5 minutes from detonation of nuclear deterrent 18 million American People will be wiped out from earth ? আপনি যেতে পারেন। আমি ভাবছি।'

আরেকটি চিত্র।

সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ সামরিক প্রধানদের চিন্তিত কণ্ঠে প্রায় একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। তিনি একই ধরনের জবাব পান। তিনি বলেন যে, বিশ্ব সমাজে আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা নিক্ষেপ করার জন্যে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়নি।

তবু কিউবার দিকে সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজ এগোতে থাকে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল ব্যক্তিগত পর্যায়ে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করে অনুরোধ জানান যেনো তিনি সম্ভাব্য মারণযজ্ঞ থেকে বিশ্বকে রক্ষা করেন।

শেষ পর্যন্ত সংকটের অবসান ঘটে। পৃথিবী অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে যায়। পরবর্তীকালে বার্ট্রাণ্ড রাসেল পুরো বিশ্বের অস্তিত্ববোধ নিজের মধ্যে ধারণ করে খেদোক্তি করে বলেছেন— 'বোধ হচ্ছিলো এতদিনের মানবসভ্যতা নিমেষে লয় হয়ে যাবে। মোজার্টের সঙ্গীত, পিকাসোর শিল্পকলার আবেদন উপভোগ করার মতোন একটি প্রাণীও ধরাপৃষ্ঠে বেঁচে থাকবে না।' মহান রাসেলের কাল অতিক্রম করে ইতিহাস আরো অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আণবিক যুদ্ধভীতি এতোটুকু হ্রাস পায়নি। সংকট অধিকতর মাত্রায় জোরালো হয়ে উঠছে এবং আরো ভয়াল বাঁকা পথে।

'মহাশূন্য কর্মসূচীর' বিরোধিতা করে রাসেল বলেছিলেন—

'we should not disturb the course of the heavenly bodies.' তাঁর মহৎ হৃদয়ের আর্তনাদ কেউ পাত্তা দেয়নি। এ সম্পর্কে মূল গ্রন্থের প্রকাশক লিখেছেন—

'what spurs a famous philosopher, at the age of 89, to plunge into a political campaign of civil disobedience and to go to prison for his beliefs ? The answer is an urgent corcern for the continuance of mankind."

বিশ্ববাসী যদি তাঁর আবেদনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আণবিক প্রলয় এসে সব কিছু নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে যাবে। পৃথিবী সবচে অনিষ্টকর ও ধ্বংসকামী মানুষ নামের প্রজাতিকে ঘৃণাভরে বিসর্জন দিয়ে নতুন কোনো উন্নততর প্রজাতিকে লালন করে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বহু বছর আগে রাসেল একবার বলেছিলেন—' 'যেভাবে আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার প্রতিযোগিতা চলছে তা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন হবে না---সর্বত্র অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হবে—বাতাসে আগুন জ্বলবে, জলে আগুন জ্বলবে---চারদিক অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত হবে।"

অধিকাংশ মানবপ্রেমিক পদার্থবিজ্ঞানী রাসেলের উদ্বিগ্নতার প্রতিধ্বনি করেছেন। তবু কিছুই থেমে নেই। উন্নত বিশ্ব প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠছে। তৃতীয় বিশ্বের জনগণ ভিক্ষার পাত্র নিয়ে পরাশক্তিসমূহের করুণা প্রার্থনা করছে। তারা জানে না কী হতে যাচ্ছে। এক মুষ্টি অন্নই তাদের কাছে সব কিছু। মারণাস্ত্রের পরোক্ষ শিকার হয়ে একদিন ওরা

হয়তো এমনিতেই নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে বাঁচার এক-মাত্র পথ হচ্ছে বিশ্ব সরকার গঠনের ব্যাপারে রাসেল কর্তৃক উপস্থাপিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা। উন্নত বিশ্বের মতিগতি সেদিকে যাচ্ছে না। কাজেই অস্তিত্বের সংশয় থেকে যাচ্ছে। সত্যিই কি মানবজাতি ধরাপৃষ্ঠে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে?

নাট্যকার মার্লো ঠিকই বলেছেন—'Accurst be he that first Invented war.'

যুদ্ধের প্রথম উদ্যোক্তা অবশ্যই অভিশপ্ত। এ গ্রন্থের অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় কার্তিক, ১৩৮৪ মোতাবেক নভেম্বর, ১৯৭৭ সালে। প্রকাশ করেছে বাংলা একাডেমী।

দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পরে নওরোজ কিতাবিস্তানের স্বত্বাধিকারী আবদুল কাদির খান সাহেবের সহৃদয়তায় দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হলো। আণবিক যুদ্ধবিরোধী যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল এ গ্রন্থের মাধ্যমে তা যদি আমাদের বর্তমান অবস্থানকেও নাড়া দিয়ে যেতে সক্ষম হয় তাহলে মনে করবো আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। সত্যিই এ হচ্ছে বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর 'a testament for mankind.' মানব জাতির জন্যে দিক-দর্শন।

সিদ্দিকুর রহমান
১২ মার্চ, ১৯৮৮

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রস্তাবনা, না উপসংহার?

"মানুষ বা যুক্তিবাদী জীব—কিছুটা অহমিকার সাথে নিজেকে যে নামেই অভিহিত করুক না কেন, সে যেমন মর্তলোকের প্রাণীসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি আবার বিরক্তিকরও বটে।"

মঙ্গলগ্রহের কোন দার্শনিক জীববিদ্যা বিশেষজ্ঞ যদি আমাদের উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জগৎ সম্পর্কে কোন বিবরণ লিখতেন তাহলে সম্ভবতঃ উপরোক্ত মন্তব্যটাই হতো তার বিবরণের শেষ পরিচ্ছেদের প্রথম বক্তব্য। আমাদের কথা বলতে গেলে, আমরা সবাই নিজেদের ব্যাপারে সহজাত উচ্ছ্বাস প্রবণতার দরুন এত বেশী নিয়োজিত যে, বাইরের পৃথিবীর কোন অভ্যাগতের পক্ষে যে পরিমাণ নিরপেক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা অর্জন সম্ভবপর তা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ধরনের কল্পিত মঙ্গলগ্রহের বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে আমাদের নিজেদের মূল্যবোধ যাচাই করা প্রয়োজনীয় এবং এর জন্যে যা দরকার তা হোল আমাদের জীবকুলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের (অবশ্য ভবিষ্যৎ বলে যদি কিছু আমাদের থেকে থাকে) কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ করে একটা মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। শুধু তাই নয়, আমাদের আরো পর্যালোচনা করে দেখা দরকার, আমরা যা করেছি, তা ভালোই হোক কিংবা মন্দই হোক, পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্ট জীবসমূহের জন্যে এর মূল্য কতখানি। আরো ভেবে দেখা দরকার, এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যতেও বা আমরা কি করবো। এ ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্ষণস্থায়ী ভাবাবেগের কোন গুরুত্ব নেই। যেমন বিমান থেকে ছোট ছোট পাহাড়সমূহ সমতল ভূমি বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে, স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ বস্তু দৃঢ়ভাবেই এর অস্তিত্ব বজায় রাখে। কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা দিয়ে এর ক্ষেত্রবিশেষ সীমিত করা সম্ভব নয়।

প্রথম পর্যায়ে অস্তিত্বের সংগ্রামে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি খুব একটা আশানুরূপ

BanglaBook.org

ছিল না। তখনও সে ছিল কদাচিৎ পরিদৃষ্ট জীব। বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে বানর যত ক্ষিপ্রতার সাথে নিজেকে রক্ষা করতে পারতো, মানুষ ততটা পারতো না। কেননা, গাছে আরোহণের ব্যাপারে সে ছিল বানরের চেয়ে কম গতিসম্পন্ন। দেহে বিরল লোমসম্পন্ন মানুষ সহজেই শীতের প্রকোপে কষ্ট পেত। তা' ছাড়া ছিল আরো সমস্যা। মানুষ তার দীর্ঘ শৈশবের দরুন খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে অন্যান্য জীবের সাথে প্রতিযোগিতায় তাল সামলাতে ছিল অক্ষম। ফলে, তার কষ্ট আরো বেড়ে যেত। অবশ্য, তার একটা প্রাথমিক সুবিধা ছিল এবং তা ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তি। আর একমাত্র তার বুদ্ধিবৃত্তিই ক্রমশঃ তার অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সাহায্য করে। ফলে, একদিন বন্য জন্তুর শিকার থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে পলায়নতৎপর মানুষ সে অবস্থা থেকে মুক্তি পেয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলো জগতের প্রভু হিসাবে। এ ধারার প্রারম্ভিক ব্যবস্থাসমূহ হোল প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার এবং এ ক্রমবিবর্তনের ধারা আনুমানিক তথ্যের উপরে নির্ভরশীল। সে শিখে নিল আগুনের ব্যবহার এবং সে আগুন ছিল বর্তমান কালের পরমাণুশক্তির মত ভয়াবহ ব্যাপার—যদিও এর ব্যাপ্তি ছিল তুলনামূলকভাবে কম। আগুন শুধু মানুষের খাদ্যদ্রব্যকেই উন্নতমানের করেনি, ঘুমোবার মুহূর্তে গুহার মুখে প্রজ্বলিত আগুনের শিখা তাকে বিপদ থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারেও নিশ্চয়তা বিধান করতো। ক্রমানুয়ে আবিষ্কার হোল বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র—যেমন বর্শা, তীর ও ধনুক। সে খুঁড়ে রাখতো গুপ্তগর্ত যার মধ্যে উন্মত্ত হস্তী জাতীয় প্রকাণ্ড জন্তু আটকে পড়ে অসহায়ভাবে মৃত্যুর সাথে লড়াই করতো। এভাবে পশু হোল মানুষের গৃহপালিত এবং ইতিহাসের শুরু থেকে মানুষ আবিষ্কার করে নিল চাষাবাদ ব্যবস্থা।

কিন্তু মানুষ যা কিছু অর্জন করেছে এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটা জিনিষ এবং তা হচ্ছে: ভাষা। এ কথাটা স্বীকার করতেই হবে যে, কথ্যভাষা খুব ধীরে ধীরে শুধু বিভিন্ন প্রাণীর উচ্চারিত বিবিধ ধ্বনিসমষ্টি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। লিখিত ভাষা প্রথম অবস্থায় কথ্য শব্দমালার পুরোপুরি বাহক ছিল না। তা' ছিল তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্কিত ছবিমালার প্রতিফলন যা ক্রমাণ্বয়ে বিশেষ একটা রচনাশৈলিতে রূপান্তরিত হয়। ভাষার প্রধান বিশেষত্ব হোল যে এর মাধ্যমে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা পরস্পরকে জানাতে পারি। ভাষার মাধ্যমেই শুধু একটা যুগের লব্ধ অভিজ্ঞতা অপর

BanglaBook.org

একটা যুগে সঞ্চালন করা সম্ভবপর হয়। লিপিবদ্ধ নির্দেশসমূহ সহজেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সম্পূরক হতে পারে। জ্ঞানভাণ্ডার সংগঠনে বক্তৃতার চেয়ে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তুর প্রয়োজন বেশী। তা ছাড়া স্মৃতিশক্তির সম্পূরক হোল লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তু এবং ব্যক্তি বিশেষের এ ধরনের সুবিধাসমূহের আবিষ্কার মানুষের উন্নতির পথে বিপুল পরিমাণে সাহায্য করেছে। এমন দিনও ছিল যখন দৈহিক উন্নতির সাথে সাথে মস্তিষ্কেরও উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

কিন্তু তা হোল প্রায় পাঁচ লাখ বছর আগের কথা। এর পরে মানবিক বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি খুব কমই হয়েছে। আর যদি হয়েও থাকে তা শিক্ষা ও সনাতন নীতির উপরেই পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে সম্ভবপর হয়েছে।

মানব সভ্যতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে। সম্ভবতঃ এর পেছনে কোন প্রকার চেতনালব্ধ উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু একবার যখন এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তখনই জ্ঞানের উন্নতির ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের স্বাভাবিক গতিতে এনে দেয় প্রচণ্ড আয়োজন। বিগত পাঁচ শতাব্দীতে যে পরিমাণ উন্নতি সাধিত হয়েছে তা বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, তা স্মরণীয় কালের লিপিবদ্ধ যে কোন পূর্বেকার ইতিহাসের চেয়ে অধিকমাত্রায় ব্যাপকতর ও মূল্যবান। আমাদের যুগের অন্যতম সমস্যা হোল, আমাদের সহজাত ধারণা যান্ত্রিক কলাকৌশলের পরিবর্তনশীলতার সাথে দ্রুত তাল মিলাতে সক্ষম নয়। ফলে, কলাকৌশলের উন্নতি হচ্ছে সত্য, কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। খ্রীস্ট জন্মের পরে সহস্র বছর দীর্ঘ-কালীন সময়ে মানুষের অস্তিত্বের প্রশ্ন সংকটাপন্ন ছিল না এমন কথা বলা যায় না। তবে সে অবস্থা থেকে মানুষের মুক্তির পথ করে দিয়েছিল তার অতীতের সংগ্রামমুখর জীবন থেকে লব্ধ নৈপুণ্য, প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতা। অবশ্য, তখনও তাকে নানা ধরনের অমানবিক বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছে। যেমন, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। ঐ সময়ে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো সে বিষয়ে 'বুক অব্ জেনেসিস্'-এ বিশদ বর্ণনা রয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে চীন-বাসীরা তাদের ইতিহাসের শুরু থেকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতো তা হচ্ছে, পীত নদীর দু'ধারে বাঁধ নির্মাণ। পক্ষান্তরে, 'নোহ্'-এর প্রচলিত গল্প থেকে জানা যায় যে, পশ্চিম এশীয়বাসীরা মনে করতো যে বন্যার ধ্বংসলীলা

BanglaBook.org

থেকে রেহাই পাওয়ার সম্ভাব্য পথ হোল সৎ জীবনযাপন করা। আগ্নেয়-গিরির উদ্‌গীরণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও এ ধরনের মনোভাব ওরা পোষণ করতো। 'সোডম' ও 'গমোরাহ্' ধ্বংসের কাহিনী বর্ণনায় আলোচ্য মনোভাবের কাব্যিক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানকালে ঐ দু'টো ধারার পরস্পর বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য, চৈনিক মতবাদের প্রভাব ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলী বিশ্লেষণে একটা বিশেষ সত্য প্রতীয়মান হয় যে, সৎ জীবনযাপন (ঠিক সনাতন অর্থে নয়) অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে বাঁধ দিয়ে বন্যা রোধ করার মত সমভাবে প্রয়োজনীয়।

প্রকৃতির ভীষণ প্রতিকুলতা সত্ত্বেও মানুষ অমানবিক বিপদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং এর সাথে সাথে নতুন পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে তার সহজাত প্রবৃত্তি ও উচ্ছ্বাসঘন মানসিকতা যা দিয়ে পূর্ববর্তী যুগের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছে। এ অবস্থায় উপনীত হওয়ার জন্যে তাকে কম বেগ পেতে হয়নি---এর জন্যে তাকে কঠিন সংগ্রাম ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়---সতর্ক অবকাশ, সংগ্রামী মনোভাব, নিরুদ্ধভীতি ও সংকটময় মুহূর্তে প্রবল আত্মবিশ্বাসেরও প্রয়োজন ছিল। এত সব মোহ ও অভ্যাসের কর্মতৎপরতার কি আর কোন প্রয়োজন ছিল যখন পুরনো বিপদের ঝুঁকি মানুষ অতিক্রম করতে পেরেছে? এ প্রশ্নের একটা সমাধান মানুষ অবশ্যই খুঁজে বের করেছিল। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, সেই সমাধান মোটেই সুখকর ছিল না। এতদিন যাবত যে সংগ্রাম ও সন্দেহ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের প্রতি নিয়োজিত ছিল সেই সংগ্রাম ও সন্দেহ সে ব্যবহার করতে শুরু করে তার স্বজাতীয়দের প্রতি। অবশ্য, যে সব কলাকৌশল আয়ত্তের ফলে সে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল ঐ সব শিক্ষার জন্যে তার প্রয়োজন ছিল পারস্পরিক সহযোগিতার। বস্তুতঃ সে তার অর্জিত কলাকৌশল স্বগোত্র বহির্ভূত লোকের বিরুদ্ধেই বেশী ব্যবহার করেছে।

এভাবে স্বগোত্রীয় সমঝোতা ও সুসংবদ্ধ যুদ্ধে বহু শতাব্দী যাবত নিয়োজিত থেকে মানুষ সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিল। এই উপলব্ধির পেছনে ছিল তার সহজাত হিংস্রতা ও সন্দেহপ্রবণতা—যে হিংস্রতা ও সন্দেহপ্রবণতায় অতীত সংগ্রামের বীজ উপ্ত ছিল। ইতিহাসের শুরু থেকে আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত বুদ্ধিমত্তার আবিষ্কৃত দক্ষতা ক্রমবর্ধিষ্ণু

BanglaBook.org

আকারে আমাদের পরিবেশকে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগ যা আদিম পৃথিবীর উগ্র জীবনের জন্যে প্রয়োজন ছিল তা এখনো অপরিবর্তণীয় রয়েছে। যে ভয়-ভীতি ও শঙ্কা এতদিন সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে এখন সেসব সমাজবদ্ধ মানুষের প্রতি ব্যবহার করা শুরু করে দিল।

মানুষ মৌমাছির কিংবা পিপঁড়ের মত পুরোপুরি সামাজিক জীব নয়। ঐ সব কখনো অসামাজিক কোন কার্যকলাপের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। মানুষ প্রায়ই তাদের রাজাকে হত্যা করেছে। কিন্তু মৌমাছিরা ওদের রাণীকে কখনো হত্যা করে না। অপরিচিত কোন পিপঁড়ে যদি দৈবাৎ অন্য কোন পিপঁড়ের গর্তে প্রবেশ করে, তৎক্ষণাৎ তাকে মেরে ফেলা হয় এবং এর জন্যে কোন প্রকার 'শান্তিবাদী' প্রতিবাদ কখনো গড়ে উঠে না। ওদের মধ্যে দলত্যাগী সংখ্যালঘিষ্ঠতা কখনো দেখা যায় না। সামাজিক সংযোগ-প্রবণতা নিশ্চিতভাবে এদের প্রত্যেকের নিজস্ব জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের ব্যাপারে রয়েছে এর উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। আদিম মানুষ সম্ভবতঃ তার পরিবারের বাইরে কোন বৃহত্তর সামাজিক দলের অস্তিত্ব জানতো না। ফলে, বলা চলে মানুষ স্বজাতীয় শত্রুর বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে তার পরিবারকে সম্প্রসারিত করে নিল গোত্র-পর্যায়ে। অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যে যে সমস্ত পরিবারের পূর্ব-পুরুষ এক বলে মনে করা হোত—সেই সব পরিবার একত্রে এক একটি গোত্রের সৃষ্টি করে। যুদ্ধের ফলে কতকগুলো গোত্র একত্রিত হোত; এইরূপে সৃষ্টি হোত বিভিন্ন জাতির। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের ও মিত্র শক্তির প্রয়োজনীয় সামাজিক ঐক্য প্রায়ই ভেঙ্গে পড়েছে—আর যখনই তা ঘটেছে তখনই পরাজয়কে আর রোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলাফলটা অবশ্য খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক ছিল। মানুষ কতকটা প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং কতেকটা নিজস্ব স্বার্থের তাগিদে দলবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করার ওরুত্ব শুধু অনুধাবনই করেনি বরং এ ব্যাপারে তাদের পূর্ব-পুরুষ অপেক্ষা অধিকতর সামাজিকতার প্রমাণ দিয়েছে।

ছয় হাজার বছরের সুসংবদ্ধ যুদ্ধের পরিণতিতে গড়ে উঠেছে আমাদের বর্তমান পৃথিবী। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিজিত জনপদের সবাইকে ধ্বংস করার মাধ্যমে তাদের জনসংখ্যা নিদারুণভাবে কমিয়ে দেওয়া হোত। যুদ্ধে বিজয় লাভের ব্যাপারে যে সমস্ত কারণ বিশেষভাবে দায়ী এগুলোর মধ্যে

BanglaBook.org

অন্যতম ছিল জনসংখ্যার আধিক্য। এ ছাড়াও ছিল বিজয়ীদের উন্নতমানের কলাকৌশল ও সামাজিক সংগঠন। সবার উপরে ছিল ওদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কর্মতৎপরতা। বিশেষ করে জৈবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তেমন কোন কিছুকেই উন্নতমানের বলে মনে করতে পারি যা বিশেষ কোন এলাকার জনসংখ্যাকে বৃদ্ধি করতে পারে। এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বহু যুদ্ধকেই আমরা সৌভাগ্যজনক বলে অভিহিত করতে পারি।

রোমানগণ তাদের সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের অধিকাংশ স্থানে জনপদ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্বে আমেরিকায় যে পরিমাণে ইণ্ডিয়ানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা ছিল, কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পরে সেই তুলনায় পশ্চিম গোলার্ধের বহুগুণ বেশী লোকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা হয়েছিল। যুগ যুগ ধরে যুদ্ধের পরে সেখানকার কেন্দ্রীয় সরকার বিপুল পরিমাণ লোকসংখ্যা বাড়াতে সমর্থ হয়েছিল। মঙ্গোলরা পারস্যের অপূরণীয় ক্ষতির জন্য দায়ী। তেমনি তুর্কীরা খলিফাদের সাম্রাজ্যকে দিয়েছিল চরম আঘাত। উত্তর আফ্রিকা রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হয়েছিল মরুভূমি এলাকা তার চাক্ষুষ প্রমাণ বহন করে। 'তাইপিং' বিদ্রোহের ফলে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রথম মহাযুদ্ধে নিহতদের সংখ্যাকেও হার মানিয়ে দেয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল অনগ্রসর জাতিরাই। তা সত্ত্বেও অনুমান করা হয় যে, সর্বমোট ফলাফল খুব দুঃখজনক হয়নি। অতীতের যুদ্ধকলহ জনসংখ্যা হ্রাস তো করেইনি বরং বৃদ্ধি করেছে।

জৈবিক প্রশ্নের কথা বাদ দিলেও, আরেকটা লক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। শুধু সংখ্যার দিক থেকে চিন্তা করলে পিপঁড়ের সফলতা মানুষের চেয়ে বেশ কয়েকশত গুণ বেশী। আমি অস্ট্রেলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় উইপোকা ছাড়া কোন মানুষের চিহ্ন দেখতে পাইনি। অবশ্য, এ জন্য উইপোকা আমাদের চেয়ে উন্নত বলে আমরা মনে করতে পারি না। বৃহৎ স্তন্যপায়ী জীবসমূহের মধ্যে মানুষের সংখ্যাই হোল সব চেয়ে বেশী এবং এই বিশেষ দিক ছাড়াও মানুষের আরো বহু উল্লেখযোগ্য গুণাবলী রয়েছে। আর ঐ সমস্ত গুণাবলী, যা সুস্পষ্টভাবে মানবিক, সে সবকে সমষ্টিগতভাবে আমরা সাংস্কৃতিক বা কৃষ্টিবিষয়ক বলে চিহ্নিত করতে পারি এবং এগুলো সামাজিক বৈশিষ্ট্যের চেয়ে ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যেরই মাহাত্ম্য জাহির করে। ঐ সব

BanglaBook.org

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ আবার সামাজিক সংঘবদ্ধতা ও যুদ্ধবিজয় দক্ষতার থেকে বেশ কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র।

মানব জাতিকে পরস্পর বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিভক্ত করার ফলে জাতীয় মর্যাদার ক্ষেত্রে সত্যিকার আসন কার প্রাপ্য এটা নির্ধারণ করা বেশ কঠিন ব্যাপার। আমাদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বৃটেনে আমরা বিখ্যাত জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ উৎসর্গ করেছি নেলসন ও ওয়েলিংটন-এর সম্মানার্থে—যারা বিদেশীদের হত্যা করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছিল। মজার ব্যাপার হোল যে, ঐ ধরনের কার্যকলাপের জন্য বিদেশীরা বৃটেনবাসীদের মত শ্রদ্ধা পোষণ করে না। যদি আপনি শিক্ষিত বিদেশীদের কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে ওদের মতে বৃটেনের প্রধান গৌরবের বস্তু কারা, তখন দ্বিধাহীন কণ্ঠে ওরা শেক্সপীয়ার, নিউটন ও ডারউইন প্রমূখ ব্যক্তিদের নাম করবে---নেলসন কিংবা ওয়েলিংটন-এর নয়। যদি মনে করা হয় যে মানব সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে কোন কোন সময়ে বিদেশীদের হত্যার প্রয়োজন ছিল তাহলে হয়তো আপাততঃ তা আমরা মেনে নিতে পারি। কিন্তু এর সমর্থনে যে যুক্তির অবতারণা করা হয় তা থেকে মনে হয় যে তখন শুধু পুলিশী তৎপরতাকে প্রাধান্য দেওয়া হোত। আর প্রাধান্য দেওয়া হোত জাতীয় গৌরব ও মর্যাদাবোধকে। তবু একথা বলা প্রয়োজন, গণহত্যার কলাকৌশল মানব জাতির সম্মানের মাপকাঠি নয়।

মিশরীয় 'বুক অব ডেড্'-এর ঘটনার মত যখন সর্বশেষ মানুষ পাতালের বিচারকের সামনে হাজির হয়ে নিবেদন করবে যে তার জীবগোষ্ঠীর সবাইকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, তখন বিচারকের কিছু বলার মত যুক্তি থাকবে না। আমার মনে হয়, তিনি বলতে পারতেন যে মানব জীবন সাধারণতঃ সুখকর। কিন্তু এ যাবত, যে-কোন ভাবেই হোক, কৃষি আবিষ্কার, সামাজিক অসাম্য, সুসংবদ্ধ লড়াই মানব জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে দিয়েছে মারাত্মক বেদনা, অসহনীয় পরিশ্রম এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিয়োগান্ত পরিস্থিতি। তবে বোধ করি এমন দুরবস্থা আর ভবিষ্যতে ঘটবে না। কেননা সামান্য পরিমাণ জ্ঞানও এখন মানব জীবনকে সুখকর করে তুলতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সামান্য চেতনাটুকু মোটেই আসবে কিনা কে বলতে পারে? ইতিমধ্যে, 'অসিরিস'-এর অনুমোদনের জন্য আমাদের সর্বশেষ মানুষ যা উপস্থাপিত করবে তা আর যা-ই হোক অন্ততঃ মানবজীবনের সুখের ইতিহাস

BanglaBook.org

যে নয় এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়।

মানব জাতির অস্তিত্বের স্বপক্ষে 'অসিরিস'-এর দরবারে যদি আমাকে যুক্তি প্রদর্শন করতে হোত তাহলে অবশ্যই আমি বলতাম: "ওহে ন্যায়নিষ্ঠ অনমনীয় বিচারক! আমার প্রজাতিদের অভিযোগ পুরোপুরিভাবে গ্রহণ-যোগ্য এবং বর্তমানে তা এতবেশী গ্রহণযোগ্য যে এর আগে কখনও ততটা ছিল না।"

আমরা সবাই অপরাধী নই এবং আমাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই রয়েছেন যাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে রোধ করার মত ক্ষমতা রয়েছে। এ কথাটা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে যে, সবেমাত্র অজ্ঞতার নিস্পৃহ অবস্থা থেকে শুধু অস্তিত্বের জন্য ব্যাপক সংগ্রাম শেষে আমরা বর্ত-মান স্তরে পৌঁছেছি। যা কিছু আমরা জানি এর সমস্তটাই গত বারোটা যুগের লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলাফল। প্রকৃতির উপরে প্রভাব বিস্তারের নতুন ক্ষমতার উন্মাদনায় আমরা অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদেরই প্রতিবেশীদের প্রতি ক্ষমতার দাপট দেখাতে শুরু করেছি। এটা অন্য কিছু নয়—এটা হচ্ছে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার বিভ্রান্তিকর আকর্ষণ। তবু বলবো যে, এ ধরনের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তি আমাদের সমস্ত কর্মস্পৃহাকে বিপথগামী করতে পারেনি। আজকের বিশ্বে পরমাণু ও নীহারিকা, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বস্তু সম্বন্ধে যে জ্ঞান আমরা অর্জন করেছি তা আমাদের পূর্ববর্তীকালের তুলনায় বেশী।

'আপনি হয়তো ব্যঙ্গ করে বলতে পারেন, জ্ঞানের অনুশীলন শুধু ওদেরই সাজে যারা যথেষ্ট বিজ্ঞতার সাথে তা ব্যবহার করতে জানে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, ঐ প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এখনও মুছে যায়নি। অবশ্য স্বীকার করছি, সে সব বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে রয়েছে—কোন প্রকার ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার মত ক্ষমতা এদের নেই। ঋষি ও পয়গম্বরেরা দ্বন্দ্ব-কোলা-হল-এর বিরুদ্ধে বাণী প্রচার করেছেন এবং এর নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা যদি তাঁদের কথা শ্রবণ করি তাহলে নতুন শান্তির পথে এগিয়ে যেতে পারবো।

'শুধু পরিত্যাজ্য বস্তু সম্বন্ধেই মহাপুরুষেরা আমাদের সতর্ক করে দেন্‌নি—বরং এর সাথে সাথে আরো দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে উজ্জ্বল ও অত্যুৎকৃষ্ট পৃথিবী সৃষ্টির যাবতীয় সম্ভাবনাই আমাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে।'

মনে করুন কবি, সুরকার ও শিল্পীদের কথা—যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বকে

BanglaBook.org

দিয়েছে অপূর্ব আলোর দ্যোতনা। এসব কল্পনার রাজ্যে হয়তো আমরাও বিচরণ করতে পারতাম এবং মানবিক সম্পর্কও হয়তো গীতি কবিতার সৌন্দর্যে আপ্লুত হতে পারতো। নর-নরীর প্রেমের সম্পর্কে কখনো কখনো এমন মুহূর্ত আসে যখন হৃদয় দিয়ে এসবের সম্ভাবনা ওরা উপলব্ধি করে। কিন্তু এমন কোন যুক্তি থাকা উচিত নেই যে জন্যে আমাদের এ সুন্দর সম্ভাবনাকে আমরা একটা ক্ষুদ্র গণ্ডির দেয়ালে আবদ্ধ করে রাখবো। সঙ্গীতের সুর মুর্চ্ছনার ঐক্যতানে তা তো সারা বিশ্বকে জড়িয়ে রাখতে পারতো। আমার মনে হয় এসব মানুষের আয়ত্তের বাইরে নয় এবং যদি সময় আসে তাহলে হয়তো ভবিষ্যতের বংশধরেরা তা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

ঐ সমস্ত কারণে, ওহে মহান 'অসিরিস' আপনার দরবারে বিনিতভাবে প্রার্থনা করছি, আপনি দয়া করে আমাদের একটু অবকাশের সুযোগ দিন। আর এ অবকাশের সুবাদে আমরা আমাদের আদিম অপরাধ থেকে বিমুক্ত হয়ে আলোককোজ্জ্বল, প্রেমময় ও সুধাভরা পৃথিবীতে উপনীত হওয়ার সুযোগ পাব।

হয়তো আমাদের এ আকুল নিবেদন ব্যর্থ হবে না। যে কোন অবস্থায়ই এ হচ্ছে মানুষের একান্ত কামনা। আর যতদুর জানি, এ সম্ভাবনার অভিলাষেই মানুষ বেঁচে থাকবে। তাছাড়া, আমাদের প্রজাতির অস্তিত্বের স্বপক্ষে এসব আমাদের যুক্তিও বটে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

দ্বিতীয় অধ্যায়

আণবিক বোমা

মানব সমাজ এখন যে যুগে বাস করছে এবং সম্ভবতঃ খুব শীঘ্রই সে যুগে মানুষের সামগ্রিক অস্তিত্ব বিলোপ পাবে—এর নাম আণবিক যুগ। ১৯৪৫ সনের আগস্ট মাসের ৬ তারিখে হিরোসিমায় প্রথম আণবিক বোমা বর্ষণ হয়। ঐ দিনটি থেকেই সাধারণ মানুষের কাছে সূত্রপাত হোল আণবিক যুগের। এমন ধরনের মারণাস্ত্রের আবিষ্কার যে সম্ভব তা আণবিক বিজ্ঞানী ও আমেরিকার উর্ধ্বতন মহলের কাছে কিছুদিন আগে থেকেই জানা ছিল। দ্বিতীয় মহাসমরের ঠিক শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও বৃটেন আণবিক বোমা আবিষ্কারের ব্যাপারে গবেষণা চালাতে থাকে। যেদিন রাদারফোর্ড পরমাণুর গঠন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন সেদিন থেকেই সকলের ধারণা যে, এর মধ্যে অপরিমিত বিস্ফোরক শক্তি রয়েছে। পরমাণুর গঠনে রয়েছে ক্ষুদ্র আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় পদার্থের প্রক্রিয়া যাকে বলা হয় 'Nucleus' বা কেন্দ্র পরমাণু। এর চারদিকে রয়েছে তড়িৎঅণুর আবর্তন। উদ্‌যান পরমাণু খুবই সাদাসিধে ও হালকা এবং এর মধ্যে একটা তড়িৎঅণুই সক্রিয়। ভারি পরমাণু যতবেশী সক্রিয় হতে থাকে ততবেশী এর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পরমাণুর কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়ার সঠিক অবস্থা নিরূপণে সর্বপ্রথম আবিষ্কার হোল তেজস্ক্রিয়া। আর তেজস্ক্রিয়া সংগঠিত হয় ঐ আবর্তনের ফলে। আগে মনে করা হোত যে, পরমাণুর আবর্তনে নিহিত রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেও সে শক্তি বিমুক্ত করার পদ্ধতি জানা ছিল না। বিশেষ অবস্থায় জড় পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যে সম্ভবপর এ হোল এক বিপ্লবাত্মক আবিষ্কার। আর এ আবিষ্কারের পেছনে যে মতবাদটি কাজ করেছে, তা হোল আইনস্টাইনের সূত্র। ঐ সূত্র থেকে জানা যায়, উৎপাদিত শক্তি হচ্ছে জড় পদার্থের হারিয়ে যাওয়া ওজন ও আলোর গতিবেগের বর্গের গুণফলের সমান। এর সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে উদ্‌যান ও হিলিয়াম

BanglaBook.org

গ্যাসের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে। একটা হিলিয়াম পরমাণুর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে চারটি উদ্‌যান পরমাণু। সুতরাং যে কারো পক্ষে ধারণা করা সম্ভবপর যে উদ্‌যান পরমাণুর চেয়ে হিলিয়ামের মৌলিক পদার্থ চার-গুণ বেশী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। যদি হিলিয়াম-এর মৌলিক পদার্থ ধরা হয় ৪, তাহলে উদ্‌যান পরমাণুর ১ না হয়ে হবে ১.০০৮। যখন চারটে উদ্‌যান পরমাণু একত্রিত হয় তখন সৃষ্টি হয় হিলিয়াম পরমাণু এবং বাড়তি অংশটা বিমুক্ত হয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে। আর ঐ অবস্থায় মৌলিক পদার্থের স্বাভাবিক আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে কারণে সূর্য উত্তপ্ত অবস্থায় থাকে, কেননা সূর্য হচ্ছে হিলিয়াম গ্যাসের কারখানার সমতুল্য। এ ধরনের প্রক্রিয়া তখনই ঘটে যখন অধিকতর হাল্‌কা মৌলিক পদার্থসমূহ ভারি পদার্থ সৃষ্টির ব্যাপারে সন্নিবিষ্ট হয় এবং এ অবস্থাকে বলা হয় 'দ্রবণ প্রক্রিয়া' বা 'ফিউশান' যা উদ্‌যান বোমা তৈরির ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আণবিক বোমার ব্যাপারে ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নেয়া হয়। কেননা ঐ পদ্ধতিটা পুরোপুরিভাবে তেজস্ক্রিয়ার উপরে নির্ভরশীল। আর এ পদ্ধতিতে, যাকে বলা হয় স্বয়ংক্রিয় 'বিচ্ছিন্নতা'—ভারি পরমাণু দ্বিধাবিভক্ত হয় দু'টো হালকা পরমাণুতে। সাধারণ অবস্থায় তেজস্ক্রিয় বস্তুসমূহে এ ধরনের আভ্যন্তরীণ সংঘাত অনবরত চলতে থাকে। তবে, এর গতিবেগ প্রাকৃতিক বস্তুসমূহে অনেকটা কম। কিন্তু 'ইউ-২৩৫' নামে এক ধরনের 'ইউরেনিয়াম' রয়েছে যা মৌলিক অবস্থায় অবিচ্ছিন্ন প্রতি-ক্রিয়ার সূত্রপাত করে। এর ব্যাপ্তি আগুনের মত যদিও গতিবেগের প্রচণ্ডতায় আগুনকেও ছাড়িয়ে যায়। এ জাতীয় বস্তুই আণবিক বোমায় ব্যবহৃত হয়েছিল। অনেকগুলো সমস্যাও ছিল এ ব্যাপারে যার সমাধান প্রাথমিক স্তরেই অপরিহার্য ছিল এবং ঐ সমস্ত সমস্যার মধ্যে ছিল 'ইউ-২৩৫'কে সাধারণ ইউরেনিয়াম থেকে পৃথকীকরণ, কেননা তা হচ্ছে ইউরেনিয়ামের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। আলোচ্য পদ্ধতির উন্নয়নের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতক 'ফুক্‌স'-এর অবদান অনস্বীকার্য। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, যদি তার বিশ্বাসঘাতকতা আগেই জানা যেত তাহলে হয়ত জাপা-নীদের বিরুদ্ধে আণবিক বোমা ব্যবহার করা সম্ভব হোত না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতেই অবিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া আবিষ্কারের সাথে সাথে আণবিক বিজ্ঞানীরা এমন ধরনের মারণাস্ত্রের সম্ভাবনার কথা নিশ্চিতভাবেই

BanglaBook.org

জানতেন এবং এই ব্যাপারে যথেষ্ট গোপনীয়তা রক্ষা করা সত্ত্বেও অনেকেই জানতেন যে, আণবিক বোমা নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। আণবিক বিজ্ঞানীদের এ কাজ হাতে নেওয়ার পেছনে যে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক পটভূমি ছিল তা হচ্ছে---নাৎসীযুদ্ধবাজদের ধ্বংস করার অনমনীয় মনোভাব। তখন মনে করা হোত (আমি মনে করি তা হয়তো সঙ্গত কারণেই) নাৎসী-বিজয় একটা ভয়ঙ্কর বিপর্জয়ের সূচনা করবে। তাছাড়া পাশ্চাত্যে আরো মনে করা হোত যে জার্মান বিজ্ঞানীরা যদি আণবিক বোমা আবিষ্কারের আগেই সফলতা অর্জন করে তাহলে মহাযুদ্ধে ওদের বিজয় লাভ কিছুতেই রোধ করা সম্ভব হবে না। মহাযুদ্ধ সমাপ্তির পরে বৃটিশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ের সাথে এ তথ্যটা জেনেছিলেন যে, জার্মানরা আণবিক মারণাস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে যথেষ্ট পিছিয়ে। প্রত্যেকেরই এ ব্যাপারটা জানার কথা যে আণবিক জাতীয় যে কোন বোমা তৈরী করার আগেই জার্মানরা পরাস্ত হয়েছিল। তবু আমি মনে করি, আণবিক বোমা তৈরীর জরুরী প্রয়োজন মনে করার জন্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের দোষারূপ করা সংগত নয়। এমন কি আইনস্টাইন নিজেও এ ধারণা পোষণ করতেন। যাহোক যখন জার্মানদের পরাজয় নিশ্চিত তখন আণবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন এরা নিজেরাও জাপানীদের বিরুদ্ধে এটার ব্যবহার মোটেই প্রয়োজনীয় বলে বিবেচনা করেননি। তাছাড়া, জাপানীরা তখন পরাজয়ের চূড়ান্ত পর্বে এবং হিটলারের মত বিশ্বের জন্যে আতঙ্কও ছিল না। অনেকেই তখন আমেরিকান সরকারের কাছে সত্বর আবেদন জানিয়েছিলেন যেন আণবিক বোমাকে যুদ্ধের মারণাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা না হয় এবং ঘোষণা করে যেন মরুভূমিতে এর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। আরো আবেদন জানিয়েছিলেন, অতঃপর যেন আণবিক শক্তিকে বিশেষ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করা হয়। ১৯৪৫ সনের জুন মাসে বিশ্ববিখ্যাত আণবিক বিজ্ঞানীদের সাতজন 'সেক্রেটারী অব ওয়র'-কে এ বিষয়ে একটা পরিকল্পনা পেশ করেন যা 'ফ্র্যাঙ্ক' রিপোর্ট নামে পরিচিত। এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দলিল এবং যদি তা রাজনীতিবিদদের সমর্থন লাভ করতে পারতো তা হলে হয়তো পরবর্তীকালের ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হোত না। উক্ত দলিল সতর্ক করে দিয়েছিল 'আণবিক শক্তির ক্ষেত্রে যে সফলতা আমরা অর্জন করেছি এর সাথে জড়িত রয়েছে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা যা পূর্ববর্তী কালের যে কোন

BanglaBook.org

আবিষ্কারের চেয়ে ভয়াবহ।' ঐ দলিল এ কথাটা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিল যে, এমন কোন বস্তু নেই যা চিরদিনই গোপনীয় রাখা যাবে এবং রাশিয়া নিশ্চয়ই কয়েক বছরের মধ্যে আণবিক বোমা তৈরী করতে সক্ষম হবে। বস্তুতপক্ষে, হিরোশিমা পর্বের ঠিক চার বছর পরেই রাশিয়া আণবিক শক্তি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছিল। অস্ত্র প্রতিযোগিতার মারাত্মক ফলাফল সম্বন্ধে উক্ত দলিলে যে সতর্কবাণী করা হয়েছিল পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ নিঃসন্দেহে এর সত্যতা প্রমাণ করে দিয়েছে। দলিলে বলা হয়েছিল---"যদি আন্তর্জাতিক চুক্তি অর্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে আণবিক অস্ত্রসজ্জা এমন এক আকার ধারণ করবে যে প্রথমবার আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের পরদিন সকাল বেলা থেকেই এ সম্বন্ধে জোর প্রচেষ্টা শুরু হবে। তারপরে অন্যান্য জাতিসমূহ তিন-চার বছরের মধ্যেই আমাদের বর্তমান অবস্থাকে আয়ত্তাধীন করতে সক্ষম হবে।" তাই দলিলে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের বিধি-ব্যবস্থা নিরূপণ করা হয় এবং উপসংহারে বলা হয়---"যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানব সমাজের উপরে এ ধরনের নতুন মারণাস্ত্র সবার আগে প্রয়োগ করে, সারা পৃথিবীব্যাপী এর জনপ্রিয়তা বিনষ্ট হবে। ফলে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং এ ধরনের মারণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক চুক্তির সম্ভাবনা চিরতরে শেষ হয়ে যাবে।" এটা কোন বিচ্ছিন্ন মতামতের বাহক ছিল না। এটা ছিল বোমা আবিষ্কর্তাদের অধিকাংশদেরই সুচিন্তিত অভিমত। আইনস্টাইনের পরেই পদার্থবিজ্ঞানে যার নাম---সেই নিয়েল্‌স্‌বোর চার্চিল ও রুজভেল্টকে একই অর্থে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু এদের কেউ ঐ আবেদনে সাড়া দেননি। রুজভেল্ট যখন মারা যান, তখন 'বোর'-এর আবেদনপত্র বন্ধ অবস্থায় তাঁর 'ডেস্ক'-এর মধ্যে ছিল। একটা দিক বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট নিরুৎসাহ করেছে এবং তা হচ্ছে এই যে এঁদেরকে অজাগতিক, অবাস্তব ও যথাযথ বিচার ক্ষমতায় অক্ষম বলে মনে করা হয়। অবশ্য, পরবর্তী কালের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্রয়োজনীয় দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে সেনানী ও রাজনীতিবিদ্‌দের চেয়ে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা অনেকাংশে গুরুত্বপূর্ণ।

হিরোশিমা ঘটনার পরে ক্ষুব্ধ আণবিক বিজ্ঞানীরা---'The Bulletin of the Atomic Scientists' নামে একটা মাসিক পত্র বের করেছিলেন যা আজ

BanglaBook.org

পর্যন্ত আণবিক অস্ত্র ও যুদ্ধের ব্যাপারে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও তথ্য সম্বলিত পত্রিকা।

১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে 'হাউস অব লর্ডস্'-এ আমি এক বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ করি যা মূলগতভাবে 'ফ্র্যাঙ্ক রিপোর্ট'-এর অনুরূপ, যদিও ঐ রিপোর্ট আমি সে সময়ে দেখিনি। কারণ, আমার ঐ বক্তৃতা 'হাউস্ অব লর্ডস্'-এর কার্যবিবরণী ছাড়া অন্য কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। আমি তখন বলেছিলাম:

'হাউস অব লর্ডস্'-এর মহান সদস্যগণ! নিজের সীমিত জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন থেকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। গতকাল ও আজকের বিতর্ক শ্রবণ করে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আমার চেয়ে পূর্ববর্তী বক্তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দশগুণ ও অভিজ্ঞতা বিশগুণ বেশী। বাস্তবিকই, আমার পক্ষে কোন কিছু বলা ধৃষ্টতা বৈ আর কিছু নয়। তবু যে বিষয়ে আমি আমার মন্তব্য সীমাবদ্ধ রাখতে চাই, তা' হচ্ছে আণবিক বোমা ও নীতি নির্ধারণে এর প্রভাব। আর বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কেননা, মানবজাতির ভবিষ্যতের প্রশ্ন এর সাথে বিজড়িত। সুতরাং, সে সম্বন্ধে আমার অবশ্যই কিছু বলা দরকার। শুরু-তেই কয়েকটা সর্বজন পরিচিত কলাকৌশল সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। প্রথমতঃ যদিও আণবিক বোমা এখনও শৈশব অবস্থায়, তবুও এটা নিশ্চিত যে অত্যন্ত স্বল্পকালীন সময়ে তা ধ্বংসাত্মক ও সহজলভ্য হয়ে উঠবে এবং এ দুটো বিষয়ই আমরা স্থির বলে মেনে নিতে পারি। তারপর আসে আরেকটা বিষয় যার সূত্রপাত করেছিলেন অধ্যাপক অলিফ্যাণ্ট এবং সেটা হোল এই যে সারা দেশব্যাপী তেজস্ক্রিয়-বস্তু ছড়িয়ে দেওয়া খুব কষ্টকর হবে না। ফলে বিস্তৃত এলাকাব্যাপী শুধু মানুষই মৃত্যুবরণ করবে না, সাথে সাথে কীট-পতঙ্গ ও সমস্ত প্রকারের জীব ধ্বংস হয়ে যাবে। তাছাড়া আরেকটি বিষয় আছে যা হচ্ছে সুদূরপ্রসারী। মহান সদস্যদের এ কথাটা জানার কথা যে, আণবিক শক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে দুটো 'থিওরী' রয়েছে---প্রথমটা হল, ভারি পরমাণুকে মাঝারী পরিমাণ ওজনে রূপান্তরিত করা যার বাস্তবায়ন এখন সম্ভব হয়েছে। অপরটা, যা এখনো সম্ভব হয়নি, তবে আশা করি অচিরেই সম্ভব হবে, তা হোল ভারি পরমাণু কিংবা হিলিয়াম পরমাণু এবং সম্ভব হলে প্রথম প্রচেষ্টায়

BanglaBook.org

নাইট্রোজেন পরমাণু তৈরী করার জন্যে উদ্‌যান পরমাণুর সংযোগ সাধন। এই সংযোগ সাধন যদি সম্ভবপর হয় তাহলে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিচ্ছিন্নতায় সৃষ্ট শক্তির চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে শক্তি বিমুক্ত হবে। বর্তমানে এমন ধরনের কোন প্রক্রিয়া এখনো দেখা যায়নি। কিন্তু অনুমান করা যায়, সৌরমণ্ডলে ও নক্ষত্ররাজির অভ্যন্তরে তা ঘটে। প্রকৃতির মধ্যে তা ঘটে সাধারণতঃ এমন তাপমাত্রায় যা সূর্যের তাপমাত্রার সাথে তুলনীয়। বর্তমান আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরে যে তাপমাত্রার সৃষ্টি করে তা শুধু সূর্যের তাপমাত্রার সমান বলে মনে করা হয়। সুতরাং বর্তমান আণবিক বোমার ব্যবহৃত যান্ত্রিক কলাকৌশলের মত কোন কিছু হয়তো একদিন উদ্‌যান থেকে অধিকতর ভারি মৌলিক পদার্থ পৃথক করে এবং ওগুলো সংযুক্তি সাধনের মাধ্যমে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর মাত্রায় বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে।

এ সবই সম্ভবপর হবে যদি আমাদের বিজ্ঞানের অগ্রগতি চলতে থাকে---নিজের ধ্বংস যদি আমরা নিজেরাই না ঘটাই তাহলে তা হতে বাধ্য। এ বিষয়টাকে শুধু আগামী কয়েক বছরের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে চলবে না। আমরা চাই, যেন মানব সভ্যতার ভবিষ্যতরে দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিচার করা হয়।

একটি সহজ প্রশ্ন: বিজ্ঞানের এই প্রগতি কি সত্যিই চলতে থাকবে? তা যদি না হয়, তাহলে কি বৈজ্ঞানিক সমাজ নিজের ধ্বংস নিজেই ঘটাবে? হতে পারে এটা সহজ প্রশ্ন কিন্তু তার গুরুত্ব অপরিসীম। আণবিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিপদের গুরুত্ব কোন প্রকার বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। রাস্তায় বের হয়ে যখন সেণ্টপল্ বৃটিশ মিউজিয়াম, পার্লামেণ্ট ভবন এবং আমাদের সভ্যতার অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভসমূহ চোখে পড়ে, তখন আমার হৃদয়ের মুকুরে ভেসে উঠে ভবিষ্যতের এক মর্মান্তিক দৃশ্য—মনে হয় ঐ সমস্ত অট্টালিকা কতগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন ধ্বংসস্তূপ আর এগুলোর চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে অগনিত মানুষের মৃতদেহ। এটাই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা যার জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। এ শুধু আমাদের গ্রাম কিংবা শহরের কথা নয়--এ হচ্ছে সমস্ত সভ্য জগতের প্রকৃত অবস্থা যতক্ষণ আমরা যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হই। যুদ্ধের ক্ষেত্র সীমিত করাই যথেষ্ট নয়। মারাত্মক ও সর্বাত্মক যুদ্ধ বন্ধ করতেই হবে। এ ছাড়া অন্য কোন পথে মানব সমাজের মুক্তি নেই।

BanglaBook.org

যুদ্ধ বন্ধ করা অবশ্যই একটা কঠিন সমস্যা। যারা এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তাঁদের দোষারোপ করার মত কোন ইচ্ছে আমার নেই। আমি নিজেও নিশ্চিত এর চেয়ে ভালো কোন কিছু করা হয়তো আমার পক্ষেও সম্ভব হোত না। আমি সরলভাবে এ কথাটাই বুঝি যে এ সমস্যা থেকে মুক্তির পথ মানুষকে খুঁজে বের করতেই হবে। নতুবা মানব জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এ পৃথিবী গ্রহ আমাদের ছাড়াই সুখী থাকবে। যদিও এমন ধরনের অবস্থা আমাদের প্রত্যাশা করা সংগত হবে না। আমি মনে করি, এমতবস্থায় আমাদের একটা যথাযথ সমাধান বের করতেই হবে। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন, আমাদের জরুরী প্রয়োজন হচ্ছে রাশিয়ার সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে এ অবস্থার উন্নতি সাধনে বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে সুকঠিন। আমি মনে করি ওয়াশিংটন ভ্রমণের ফলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে সফলতা অর্জন করেছেন, তা হয়তো ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিকই করেছেন। এটাও সত্য এর চেয়ে ভালো ঐ সময়ে কোন কিছু অর্জন করা সম্ভব ছিল না। যারা মনে করেন যে রাশিয়ার কাছে বিনাশর্তে সহসা আণবিক তথ্য ফাঁস করে দেয়া উচিত এদের মধ্যে আমি নই। আমার মতে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছুটা শর্তারোপ থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে আমি একথাটা নিশ্চয়ই বলবো যে এমন ধরনের শর্তই হওয়া উচিত যার ফলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে। বিশেষ কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য সাধনে তা ব্যবহার করা মোটেই উচিত নয়। আমাদের কথাই হোক কিংবা আমেরিকার কথাই হোক, কেউ স্ব-উদ্দেশ্য সাধনের উদ্দেশ্যে তা করা সংগত নয়। রাশিয়ার কাছে তথ্য প্রকাশে কোন আপত্তি নেই। তবে শর্ত হোল, রাশিয়ার এ জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা থাকতে হবে।

"ঐ শর্তের ভিত্তিতে যথা শীঘ্র সম্ভব রাশিয়াকেও এ সমস্ত বিষয়ে জানতে দেয়া যুক্তিসংগত। আংশিক সত্য হলেও বলা দরকার যে গোপনীয়তা বজায় রাখা শুধু স্বল্পকালীন সময়ের জন্যে সম্ভবপর। কয়েক বছরের মধ্যেই রাশিয়ানরা নিজেদের বোমা আবিষ্কারে সফল হবে এবং তা সবদিক দিয়েই আমেরিকানদের বোমার সমকক্ষ হবে। সুতরাং আলোচনার সময় খুবই সীমাবদ্ধ।

"সম্মানিত সদস্যদের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, আণবিক বিজ্ঞানীর

BanglaBook.org

আলোচ্য তথ্য প্রকাশের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী। বর্ণিত কারণে আমি এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে সম্পূর্ণ একমত নই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ও রাশিয়ানদের মধ্যে একটা ব্যাপকতর সম্পর্ক ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র বিভাগীয় সেক্রেটারীর সাথে আমি পুরোপুরি একমত। রাশিয়ানদের সাথে সহযোগিতার জন্যে শুধু আগ্রহ প্রকাশ করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের বিবেচনায়, যা অবশ্য প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব প্রকাশের কোন প্রকার জড়তা থাকা উচিত নয়। আমি মনে করি অনুনয় করে ওদের কাছ থেকে সহযোগিতা লাভ করা সম্ভব নয়। এর জন্যে প্রয়োজন হোল নিজেদের সদিচ্ছার সুদৃঢ় আশা পোষণ করা।

"আমি আশা করি এবং তা কোনক্রমেই মিথ্যে আশা নয়, সোভিয়েত সরকারকে আমরা বোঝাতে পারবো যে যুদ্ধের জন্যে আণবিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার শুধু তাদের ধ্বংস নিয়ে আসবে না, সাথে সাথে গোটা মানব জাতিরও ধ্বংস ডেকে আনবে। আমার নিশ্চিত ধারণা যে, রাশিয়া আমাদের সাথে এ ব্যাপারে একমত হবে যে, আণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সার্বজনীন মানবতার স্বার্থে এবং এ নিয়ে বিশেষ কোন দেশের বিরোধিতা থাকার কথা নয়। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, সোভিয়েতবাসীদের এ কথাটা উপলব্ধি করাতে পারলে ওরা নিশ্চয়ই সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতো। তাছাড়া ওদের বিচক্ষণতায় আমি আস্থাশীল এবং ওদের সহযোগিতা তখনই আশা করা যায় যখন সমস্ত ব্যাপারটাকে রাজনীতি ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব থেকে স্বতন্ত্র রাখা হবে। সবার ধারণা যে, এ নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট পারস্পরিক সন্দেহ। খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমেই এ ধরনের সন্দেহ প্রবণতা বিদূরিত করা সম্ভবপর এবং আন্তরিক মনোভাব নিয়ে রাশিয়ানদের বলতে হবে—"দেখুন, পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে যে সমস্ত বিষয়বস্তু আমাদের বিবেচনায় উৎকৃষ্ট এগুলো হচ্ছে তাই-ই। যদি আমাদের উভয়ের মতে আরো অন্যান্য কোন অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ গিয়ে থাকে, তাহলে চলুন, আমরা এ ব্যাপারে একটা যথাযোগ্য মীমাংসার পথ বেছে নেই। কেননা পরস্পরকে ধ্বংস করার মধ্যে আমাদের কারো কোন প্রকার কল্যাণ নিহিত নেই।" আমার দিক থেকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, যদি বিষয়টাকে খোলাখুলিভাবে এবং রাজনৈতিক

BanglaBook.org

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়ে এভাবে আমরা রাশ্যানদের নিকটে পেশ করি তাহলে বিষয়টার সারবত্তা আমাদের মত ওরাও উপলব্ধি করবে। অন্ততঃ আমি ব্যক্তিগতভাবে এ ধারণাই পোষণ করি।

"এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদেরকেও আমরা কিছুটা কাজে লাগাতে পারি। তাঁরা নিজেরাও যথেষ্ট পরিমাণে অস্বস্তিবোধ করছেন। কেননা নিজেদের সৃষ্ট কার্যকলাপের জন্য বিবেকের দংশন থেকে এঁরা নিজেরাও মুক্ত নন। যে কাজ করেছেন এর পেছনে হৃদয়ের সমর্থন যে নেই এটা এরা সত্যিই অনুভব করেছেন। মানব জাতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে কোন দায়িত্ব পেলে ওরা বরং কৃতার্থই হবেন। আমার বিশ্বাস রয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা রাশ্যানদের উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে অধিকতর সফলতা অর্জন করবে। আর যা-ই হউক, ওরা রাশ্যান বিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করে একটা মৌলিক সহযোগিতার পথ উন্মোচন করতে পারতেন। অনেক ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, আমরা আমাদের যুগের দাবীকেও অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছি। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবী রণক্লান্ত মনোভাব পোষণ করছে। আমার ধারণা, এ জন্যে কেউ আমাকে অহেতুক আশাবাদী বলে মনে করবেন না, যে অন্ততঃ আগামী দশ বছরের মধ্যে তেমন বড় ধরনের কোন যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই।

"সুতরাং এখনো প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের সময় আছে। রাশ্যানরা সংগত কারণেই মনে করেন যে, কোন প্রকার স্বার্থের সংঘাতে সারা দুনিয়া ওদের বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর দুঃখের বিষয় যে, এ সহজ সত্যটা আমাদের পক্ষের লোকেরা এখনো অনুধাবন করতে পারছেন না। রাশ্যানরা এ কথাটা উপলব্ধি করেছেন বৃহৎ তিন শক্তি বনাম পঞ্চ বৃহৎ শক্তির প্রশ্নে। রাশিয়া একদিকে আর দুই কি চার শক্তি আরেক দিকে। কোন জাতির যখন এমন অনুভূতি জাগে তখন ওদের সাথে কোন দরকষাকষির ব্যাপারে যথেষ্ট সহনশীলতার প্রয়োজন রয়েছে এবং নিশ্চয়ই সংখ্যাগরিষ্ট দলের কাছে ওদের নতিস্বীকার আশা করাও সংগত নয়। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বজায় রাখতে বেশ কিছুটা বিচক্ষণতার প্রয়োজন আছে বৈকি।

"জাতিসংঘকে আণবিক অস্ত্র সংরক্ষণের জন্যে দায়িত্ব দেওয়ার সপক্ষে মত দেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। অবশ্য একথাও সত্য যে, জাতিসংঘের

BanglaBook.org

উপরে ভরসা করার মত বর্তমানে কোন পথ দেখছিনে। কেননা এটা কোন শক্তিশালী সামরিক সংস্থা নয় এবং কোন বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার মত ক্ষমতাও এর নেই। যারই শেষ পর্যন্ত আণবিক বোমা হাতে থাকবে তাকেই বৃহৎ শক্তিকে প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা থাকতে হবে। যতক্ষণ না আপনারা ঐ জাতীয় কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করছেন, আপনাদের নিরাপদ বোধ করার কোন সংগত কারণ নেই। শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা নিরর্থক এবং তা আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করাই হোক কিংবা তৈরী করাই হোক। কারণ এমন কোন বাধ্যবাধকতা করার ক্ষমতা জাতিসংঘের নেই। যদি আপনারা যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা করেন তাহলে এ কথাটা লক্ষ্য করার প্রয়োজন যে, এমন ধরনের নিষেধাজ্ঞা মান্য করার শাস্তি তা ভঙ্গ করার চেয়ে মারাত্মক পরিণাম নিয়ে আসতে পারে। সুতরাং আমি মনে করিনে যে, এ জাতীয় লেখালেখি সত্যিকারের কোন মূল্য বহন করে।

"প্রথমেই আপনাদের এ মারণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্যে সক্রিয় মনোবল গড়ে তুলতে হবে এবং যখন তা সম্ভবপর হবে, তখনই শুধু স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা গঠনের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হবে। তাছাড়া এর মাধ্যমেই একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন সম্ভব হবে যা হবে একাধারে শক্তিশালী ও আণবিক শক্তি সংরক্ষণের একমাত্র নির্ভরস্থল। প্রকৃতপক্ষে, মহাযুদ্ধ বন্ধ করার কার্যকরী পন্থাই তাই। সহজাত রাজনৈতিক কার্যকলাপ এটাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে এবং আমরা আশা করতে পারি পৃথিবী মহাযুদ্ধের বিভীষিকা থেকে ক্রমশঃ মুক্তি পাবে। অবশ্য এ হচ্ছে একটা বিরাট অনুশাসনের কথা। তবু এ পথ আমাদের খুঁজে নিতেই হবে। হয় যুদ্ধ বন্ধ নতুবা সমস্ত সভ্য জগতের প্রগতির অবসান। তারপরে যারা থাকবে তারা ধ্বংস করার সরঞ্জাম নির্মাণের ব্যাপারে হবে সম্পূর্ণ অক্ষম। একমাত্র ঐ সমস্ত জাতিসমূহই হবে সম্পূর্ণ অনুন্নত যারা সভ্যতার সমস্ত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের সম্ভাব্য বিপর্যয় যা পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিরই উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আমার বিশ্বাস, ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাওয়ার আগে সম্ভবতঃ এরা এ সব ব্যাপার বুঝতে পারবে। যে কোন অবস্থায়, এ আশা নিয়েই আমি জেগে আছি।"

ঐ সময়ে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্যে তেমন কোন শক্তিশালী

BanglaBook.org

প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। 'হাউস অব লর্ডস' ধৈর্য সহকারে আমাদের বক্তব্য শ্রবণ করে তা সমর্থন করেছিল। যতখানি মনে পড়ে, দলমত নির্বিশেষে আমার মতামতকে সম্মান দেখিয়েছিল---দুর্ভাগ্যের কথা, পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ মতানৈক্যের সূত্রপাত করেছিল। কিন্তু তখন আমি যা বলেছিলুম এখনও আমি এর পুনরুক্তি করবো। এর মধ্যে প্রত্যাহার করার মত কিছু নেই। যদিও সর্বাত্মক মারণযজ্ঞ ঘটানোর ব্যাপারে ক্ষমতা থাকায় যুক্তরাষ্ট্র তৃপ্তি বোধ করতো তবু জাপানীদের আত্মসমর্পণের পরে আণবিক বিজ্ঞানীদের ভাবধারা কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছিল। ১৯৪৬ সনে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সামনে পেশ করল---'The Baruch plan' যা ছিল মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তবু স্মরণ করা যেতে পারে ঐ বদান্যতা প্রদর্শনের পেছনে ছিল তার আত্মতৃপ্তি যে এখনো যুক্তরাষ্ট্র আণবিক শক্তির ক্ষেত্রে অবিসংবাদিত ও একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী। 'বারুক প্লান' পরামর্শ দিয়েছিল—'আন্তর্জাতিক আণবিক উন্নয়ন সংস্থা সংঘটনের জন্যে ইউরেনিয়াম থোরিয়াম খনিজ করার ব্যাপারে এর থাকতে হবে একক ক্ষমতা। তাছাড়া এই সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকার কথা ছিল পরিশোধনীয় ব্যবস্থা, বিষয়বস্তুর মালিকানা, উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ ও চালনার দায়িত্ব, যার ফলে আণবিক শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করা যায়। 'বারুক প্লান' এ ব্যাপারে আরো পরামর্শ দিয়েছিল, যেমন---আলোচ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণে এবং আণবিক তথ্য যা আমেরিকারই শুধু জানা ছিল, তা প্রকাশ করে দিতে হবে। দুঃখের বিষয় 'বারুক প্লানে' এমন সব বিষয় ছিল যা রাশিয়ার পক্ষে প্রত্যাশিতভাবেই গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আর এ জন্যে দায়ী ছিল স্তালিন নিয়ন্ত্রণাধীন সোভিয়েত রাশিয়া। জার্মানী বিজয় উল্লাসে মত্ত থেকে পাশ্চাত্য শক্তির প্রতি সন্দিহান হয়ে (তা সংগত কারণেই) এবং জাতিসংঘে তার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকায় রাশিয়া 'বারুক-প্লান'কে আন্তরিকতার সাথে সমর্থন করতে পারেনি। আণবিক যুদ্ধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজনীয় বিশ্বসংস্থার সৃষ্টি রাশিয়া বরাবরই বিরোধিতা করেছিল। এর পেছনে যে কোন কারণ নেই তাও নয়। রাশিয়ার ধারণা ছিল যে ঐ সংস্থা শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহকেই বাঁচিয়ে রাখবে যা কম্যুনিষ্ট ধারণায় একান্তভাবেই 'অনিষ্টকর'। যদি রাশিয়ার পক্ষে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে স্বীকৃতি

BanglaBook.org

দিতেই হয় তাহলে তাকে অবশ্যই হতে হবে এমন এক সংস্থা যা অকম্যুনিষ্ট শক্তিসমূহকে প্রাধান্য দেবে না। আর 'বারুক প্লানে'র সফলতার ক্ষেত্রে এটাই ছিল বিরাট এক অন্তরায়। প্রয়োজন ক্ষেত্রে বারুক প্লান-এ সংশোধন করা মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত সরকার এমন ধরনের কোন সংস্থার ব্যাপারে আলোচনায় অংশ গ্রহণেও সোজাসুজি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন।

ফলাফলটা অত্যন্ত দুঃখজনক। রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের মধ্যে তিক্ততার সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। আমেরিকার জনমতে রাতারাতি পরিবর্তন হোল। আর কোন দিন এ সম্বন্ধে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য হয়নি।

বিজ্ঞানীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সামরিক বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদগণ ধারণা পোষণ করতে থাকেন যে, আমেরিকার হাতে এমন সব গোপনীয় তথ্য রয়েছে যা রাশিয়ার পক্ষে বহুদিন পর্যন্ত জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়। আরো একটা ধারণা বরাবরই ছিল যে, শুধু আমেরিকার হাতে আণবিক অস্ত্র থাকার অর্থ হোল পাশ্চাত্য জগতের নিরাপত্তা বিধান করা। ১৯৪৯ সনে যখন জানা গেল যে রাশিয়ার হাতেও আণবিক মারণাস্ত্র রয়েছে তখন মনে করা হোত যে বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তচরবৃত্তির দরুনই তা সম্ভব হয়েছিল। রাশিয়া অবশ্য কোন প্রকার তোড়জোড় ছাড়াই আণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের পদ্ধতি সম্পূর্ণ করেছিল। নিদারুণ দুঃখের বিষয়, যখন মনে করা হোল যে রাশিয়ানদের আণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে ওদের কর্মকুশলতার চেয়ে গুপ্তচরদের বিশ্বাসঘাতকতাই দায়ী তখন একটা ব্যাপক সন্দেহের কালোছায়া সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ফলে ম্যাকার্থীর আগমনের পথ প্রশস্ত হোল---সাথে সাথে তার সমর্থক গোষ্ঠীরও। আমেরিকা, রাশিয়া, এমনকি বৃটেন ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রনায়কগণ কিংবা জনমত এমন কোন দূরদর্শিতার পরিচয় দেননি যার ফলে বিজ্ঞানীদের কল্যাণকর পথে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিতে পারে। ঘৃণা আর দেশপ্রেম বিবেচিত হলো সমঅর্থে। যুদ্ধের জন্যে তৈরী হওয়াকে মনে করা হলো শান্তির একমাত্র রক্ষাকবচ। সারাবিশ্ব এভাবে পরিচালিত হোল বিভ্রান্তির পথে। ঘটনার শেষ এখানেই নয়। দুর্গতির পথে দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো বিশ্বমানবতা। বিপর্যয়ের সমস্ত পথ হোল প্রশস্ততর।

BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়

উদযান বোমা

আণবিক বোমা আবিষ্কারের প্রথম পর্যায়েই সারা বিশ্ব অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসলীলার আভাস দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এমনকি তখনই দাবি উঠেছিল যেন আণবিক শক্তি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। কিন্তু শীঘ্রই আণবিক অস্ত্রের আতঙ্ক সম্বন্ধে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়। তখন উপলব্ধি করা হয় যে, আণবিক অস্ত্রের ধ্বংস-শক্তিও পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও পাশবিকতাকে চরিতার্থ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, আরো একটা ধারণা ছিল যে, আণবিক বোমা শহর এলাকাসমূহ ধ্বংস করতে পারলেও পল্লী এলাকার বিক্ষিপ্ত জনসংখ্যা ধ্বংস করার ব্যাপারে সক্ষম নয়। দু'পক্ষই তখন উন্মত্ত হয়ে এরচেয়ে ব্যাপকতর শক্তিসম্পন্ন মারণাস্ত্র তৈরী করার প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে আবিষ্কার হোল—'উদ্‌যান বোমা'। নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন, এই মারাত্মক মারণাস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী আমেরিকা না সোভিয়েত রাশিয়া। তবে ব্যাপার যা-ই হোক, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই একে অপরের কাছাকাছি। মোটা-মুটিভাবে বলতে গেলে, উদ্‌যান বোমা আণবিক বোমার চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী। 'বিকিনী' দ্বীপপুঞ্জে উদযান বোমার বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্ট তাপমাত্রা বাইশ মিলিয়ন টন বিস্ফোরক দ্রব্য ক্ষমতাসম্পন্ন 'টি-এন্-টি'-এর সমান। বিস্ফোরণ ঘটানোর পরে এর সম্যক ক্ষমতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জানতে পারে। আর এই বিস্ফোরণের শক্তি আমেরিকান বিজ্ঞানীদের সমস্ত ধারণাকেও অতিক্রম করে যায়। বর্তমানে এটাই হোল উভয় পক্ষের মারাত্মক মারণাস্ত্র।

'উদযান বোমা' শব্দটার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকা বিচিত্র নয়। কেননা এর বিস্ফোরক দ্রব্যের বিরাট অংশ 'ইউরেনিয়াম' থেকে গ্রহণ করা হয়। বিস্ফোরণ ঘটে তিনটি বিভিন্ন স্তরে। কাগজ,

BanglaBook.org

কাঠ ও কয়লার স্বষ্ট আগুনের শিখার সাথে এটার তুলনা করা যেতে পারে। কাগজের চেয়ে কাঠ জ্বালানো কষ্টকর; এর চেয়ে আরো কষ্টকর কয়লা জ্বালানো। উদযান বোমায় আণবিক বোমার মত সর্বপ্রথমে দরকার হলো, 'ইউ-২৩৫' আর ইউ-২৩৫-এর বিখণ্ডিত অবস্থায় উৎপন্ন তাপমাত্রা একটা উদযান-এর সরবরাহকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করার জন্যে যথেষ্ট। 'ইউরেনিয়াম-২৩৫' এবং উদযান উভয়েই সাধারণ ইউরেনিয়াম-এর একটা ভারি কাঠামো দ্বারা আবর্তিত থাকে।

উদযান-এর হিলিয়ামে-এ দ্রবীভূত অবস্থা থেকে যে তাপ বিনির্গত হয় তা সাধারণ ইউরোনিয়ামকে সহজেই বিস্ফোরণের মাধ্যমে বাইরের কাঠামোতে নিয়ে আসতে পারে। ইউরেনিয়াম পরমাণু বহু প্রকার পাতলা ওজনের পরমাণুতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদযান বোমার প্রধান সুবিধা বিবেচিত হয় সাধারণ ধরনের ইউরেনিয়াম ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। আরো পরিষ্কার করে বলতে হলে বলা যায় যে, ঐ ধরনের ইউরেনিয়াম ব্যবহারকে সুবিধাজনক মনে করা হয়, যা থেকে বিরল ইউরেনিয়াম—২৩৫-কে গ্রহণ করা যায়। এক মাত্র প্রচুর পরিমাণ উত্তাপই সাধারণ ইউরেনিয়ামকে এ ক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে।

উদযান বোমার বিস্ফোরণের অনিষ্টকর প্রভাব শুধু বিশেষ কোন এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে না। তিজস্ক্রিয় বস্তু বাতাসের উচ্চস্তর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে সারা পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। তারপরে ক্রমশঃ নীচে নেমে আসে। ফলে, মানুষ মারাত্মক রোগের শিকারে পরিণত হয়। বিষাক্ত হয়ে পড়ে পানি, শাকসব্জি এবং মাংস। এ সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থকে বলা হয় 'ফল আউট' বা 'তেজস্ক্রিয় ভস্ম'। এগুলো সাধারণতঃ প্রকৃতির মধ্যে ঘটে না—আর ঘটলেও একান্তভাবে কদাচিৎ। একটা দুর্ঘটনার মাধ্যমে আণবিক ভস্ম ছড়িয়ে পড়ার প্রাণঘাতী প্রতিক্রিয়া সাধারণ মানুষ জানতে পারে।

একটা জাপানী মাছ ধরার নৌকো, নিয়তির পরিহাসে যার নাম ছিল 'ভাগ্যবান ড্রাগন'। আমেরিকার কর্তৃপক্ষের ঘোষিত বিপজ্জনক এলাকা থেকে বেশ কিছুটা নিরাপদ দূরে অবস্থান করছিল। কিন্তু বাতাসের আকস্মিক গতি পরিবর্তনের দরুন এটা তেজস্ক্রিয় ভস্ম রাশিতে ছেয়ে যায়।

BanglaBook.org

ফলে, সমস্ত নাবিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং এদের মধ্যে একজনের তখনই মৃত্যু ঘটে। তেজস্ক্রিয় ভস্ম যে কোন উদযান বিস্ফোরণের পরে অগণিত মৃত্যু ঘটাতে পারে। কোন সম্ভাব্য উদযান যুদ্ধে কী ঘটতে পারে এ ব্যাপারে এখনও যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। ১৯৫৮ সনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সেক্রেটারী 'প্যাণ্টাগন রিপোর্ট'-এর সারাংশ আলোচনা করতে গিয়ে হিসেব করে বলেছেন যে, 'উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি সংস্থা' ও 'ওয়ারস চুক্তির' সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আণবিক যুদ্ধে ১৬০ মিলিয়ন আমেরিকান, ২০০ মিলিয়ন রাশিয়ান এবং পশ্চিম ইউরোপ ও বৃটেনের সমস্ত জনসংখ্যার মৃত্যু অবধারিত। কেউ কেউ তখন আশ্বস্ত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, ঐ তথ্য প্রকাশনার ফলে হয়তো উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির কার্যকলাপের তীব্রতা পশ্চিম ইউরোপ ও বৃটেনে অনেকটা হ্রাস পাবে। বিশ্লেষণহীন ও আশ্চর্যজনক মৃত্যুচিন্তা পাশ্চাত্য জগৎকে ছেয়ে ফেলেছে এবং যতদূর মনে হয় আণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া জেনে শুনেও সেখানকার সরকারসমূহের মধ্যে প্রতিরোধ করার তেমন কোন ব্যবস্থা আজো গড়ে উঠেনি। তাছাড়া জনগণের মধ্যেও এ ধরনের প্রবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়। ১৯৫৬ সনের মে মাসে তদানীন্তন আমেরিকান সেনাবাহিনীর গবেষণা ও উন্নয়নের প্রধান লেঃ জেঃ জেমস্ গ্যাভিনকে যুক্তরাষ্ট্র সিনেট সাব কমিটির প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে ডাকা হয়েছিল। সিনেটের ডাফ্ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"যদি আমরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে আণবিক যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ি এবং আমাদের 'স্ট্র্যাটেজিক এয়ারফোর্স' এতে অংশ গ্রহণ করে আর বোমা বিস্ফোরণের পরে যদি বাতাসের গতিবেগ ওগুলোকে রাশিয়ার দক্ষিণ-পূর্বদিকে নিয়ে আসে, তাহলে আপনার মতে ঐ অবস্থায় মারণাস্ত্রের প্রতিক্রিয়া কি রকম হতে পারে?" জেনারেল গ্যাভিন উত্তর দিয়েছিলেন,—"স্যার, এ প্রশ্নটার উত্তর আমি দেবোই এবং উত্তরটা হবে সুস্পষ্ট। কিন্তু বিনীতভাবে আমি নিবেদন করব যে, বিমান বাহিনী কিংবা অন্য কোন পর্যবেক্ষণ দল উত্তরটা দিলে ভালো হোত। বর্তমান পরিকল্পনার হিসেব মতে উভয় পক্ষেরই কয়েকশত মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু নির্ভর করবে বায়ুর দিক পরিবর্তনের উপরে। যদি বায়ুর গতি দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় তাহলে রাশিয়াই সর্বাধিক গতিগ্রস্ত হবে এবং সম্ভবতঃ জাপান ও ফিলিপাইন এর ফলে আক্রান্ত হবে। আর যদি কোন কারণে বায়ুর প্রবাহ অন্য পথে এগিয়ে

BanglaBook.org

যায় তাহলে উল্টোভাবে পশ্চিম ইউরোপে ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে পড়বে।" এই বিবৃতি থেকে একটা বিষয় যে পরিষ্কার বোঝা যায় যে বাতাসের আকস্মিক দিক পরিবর্তন সম্ভাবনার উপরেই নির্ভর করবে, রাশিয়ার উপরে আমেরিকান আক্রমণ কি রাশিয়াই সীমাবদ্ধ থাকবে, না পশ্চিম ইউরোপীয় আক্রমণে তা রূপান্তরিত হবে। জেনারেল গ্যাভিন-এর এ বিবৃতি কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হোল। ফলাফলটা কারো অজানা নেই। তিনি অপসারিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

আণবিক যুদ্ধে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। **'On thermonuclear war'** গ্রন্থের লেখক হারম্যান কাহ্‌ন-এর মত যাঁরা জনসাধারণকে আণবিক ধ্বংসলীলার ঝুঁকি নিতে পরামর্শ দেন, ওদের বক্তব্য হোল যে বিরাট ও গভীর পরিখা খনন করে আশ্রয়স্থল তৈরীর মাধ্যমে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। কাহ্‌ন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন 'সিভিল ডিফেন্স'-এর জন্যে ৩০ কোটি বিলিয়ন ডলার ব্যয় করার জন্যে। কিন্তু তিনি নিজেও এ অংকের টাকা খরচ হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। তা ছাড়া মানুষের জীবন নিয়ে এমন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া মোটেই প্রশংসার ব্যাপার নয়। আমার মতে এ ব্যাপারে সবচেয়ে সুষ্ঠু মতামত দিয়েছেন জন্‌, এম ফাউলার তার **'Fall out'** গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলছেন যে, বিচক্ষণ ও সম্পদশালী ব্যক্তিবিশেষ কিংবা পরিবার সর্বাত্মক ধ্বংসের আওতার বাইরে থেকে এবং মৃত্যুঘাতী আণবিক ভস্মের সম্ভাবনা থেকে নিজেদেরকে দূরে রেখে প্রথম কয়েক সপ্তাহ আণবিক বিস্ফোরণের পরে বেঁচে থাকতে পারবে। তবে এটা সত্য, এদের আশ্রয়স্থলের দরজা নীরব মৃত্যুর বিভীষিকাকে পরিহার করা সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এ ব্যবস্থায় বেঁচে থাকা সম্ভবপর কিনা। পানি ও খাদ্য দ্রব্য বিষাক্ত, পরিবহন অবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, হাসপাতাল ধ্বংসপ্রাপ্ত, জীবিত চিকিৎসকের স্বল্পতা—এ সমস্ত কিছুই অশাবাদী মতবাদের অন্তরায়। আণবিক যুদ্ধের পটভূমিতেই শুধু বেঁচে থাকা হতভাগ্যদের বাহ্যিক স্বাস্থ্যই বড় কথা নয়। এর সাথে ভেবে দেখতে হবে কী পরিমাণ মানসিক স্বাস্থ্য মানব-ইতিহাসের নিকৃষ্টতম বিপর্যয়ের পরে প্রত্যাশা করা যায় এবং এটাই সম্ভবপর যে, যাঁরা বেঁচে থাকবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ সব ব্যক্তিরাই উন্মাদ

BanglaBook.org

ও সম্ভবতঃ ধ্বংসাত্মক হয়ে যাবে এবং এটা শুধু আণবিক যুদ্ধের পরিণামই নয় বরং 'সিভিল ডিফেন্স' সমর্থনকারীদের কার্যকলাপেরও পরিণাম। কাহ্‌ন-এর মত কেউ কেউ মনে করেন যে, আমেরিকান জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ হয়তো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। আমার মনে হয় এগুলো আশাবাদী ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া তেমন কিছু নয়। আর যদি এটাকে সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলেও ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে যারা কোন রকমে বেঁচে থাকবে ওদের মানসিক অবস্থাটা কি হবে? এটা কি কোনক্রমেই সম্ভব যে উল্লেখযোগ্য হারে কেউ পুনর্গঠনের জন্যে উদ্যমের সাথে কাজ করতে পারবে—যা ছাড়া ঐ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্য কোন পথ নেই? মরদেকাই রোশওয়াল্ড তাঁর **'Level-7'** গ্রন্থে মানুষের আশ্রয় শিবিরের অবস্থা কি হবে এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, কিন্তু তা প্রয়োজনীয় প্রচার পায়নি।

আশা করার মত একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে আণবিক যুদ্ধ বিষুবরেখা সম্ভবতঃ অতিক্রম করবে না এবং যদি যুদ্ধ-উত্তর গোলার্ধে সীমিত থাকে, তাহলে সারা বিশ্ব দক্ষিণ আফ্রিকান সরকারের অধিকারে থাকবে। এটা নিঃসন্দেহে 'মুক্তবিশ্ব'-এর বিজয় বলে স্বীকৃত হবে। এ জাতীয় বিপদের বিষয় যাঁরা বিবেচনা করছেন, তাঁদের কাছে কতগুলো ব্যাপার স্পষ্ট হয়ে গেছে এবং সেগুলো হচ্ছে—প্রথমতঃ আণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা; দ্বিতীয়তঃ পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার গুরুত্ব; তৃতীয়তঃ বর্তমানের কালের দ্রুত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচ্ছন্ন বিপদ, চতুর্থতঃ যে সমস্ত শক্তির হাতে এখনো আণবিক অস্ত্র নেই ওদেরকে ঐ ব্যাপারে নিরস্ত করা। যদিও আলোচ্য চারটি বিষয়ের গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত, তবু ওগুলোর একটাকেও রোধ করার জন্যে এ যাবৎ কোন সফল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হয়নি। প্রত্যেকটি আলোচ্য বিষয়ের উপরে আমি কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক এত বেশী হয়েছে যে, তাকে ক্লান্তিকর বলে অভিহিত করা সহজেই চলে। এ ধরনের বৈঠকে অনবরত একটা কৌশলেরই প্রশ্রয় নেওয়া হয়—প্রতিটি দলই দাবী করতে উদ্‌গ্রীব যে, শান্তির জন্যে ওদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। সুতরাং, প্রত্যেকেই এক একটা প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে এবং বোঝাতে চায় যে, প্রস্তাবটা গ্রহণ করলে খুবই ভালো হোত, কেননা এ ছাড়া উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আর হতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকেই

BanglaBook.org

এমন সূক্ষ্মভাবে প্রস্তাবটাকে উপস্থাপিত করে যেন অপর পক্ষ নিশ্চিতভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করে এবং কোন পক্ষই একটা যুক্তিসঙ্গত মীমাংসার স্তরে উপনীত হতে ইচ্ছুক নয়। কেননা এটাকে ভীরুতারই নামান্তর বলে ধারণা করা হয়। ১৯৫৫ সনের কোন এক সময়ে এ ধরনের কৌশল প্রয়োগ করতে গিয়ে পাশ্চাত্য এক নিদারুণ বিশ্রী অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। নিরস্ত্রীকরণের জন্যে পাশ্চাত্য বেশ সুন্দর কয়েকটা প্রস্তাব উত্থাপন করে যেগুলো পশ্চিমী সরকারসমূহের তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করে সোভিয়েত রাশিয়া সহজেই মেনে নেয়। যার ফলে পাশ্চাত্য তৎক্ষণাৎই প্রস্তাবসমূহ প্রত্যাহার করে নেয়। এ ঘটনার বিশদ বিবরণ দান করেছেন ফিলিপ নোয়েল বেকার তাঁর **'The Arms Racei'** গ্রন্থে। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, যিনিই এই বই পাঠ করবেন তিনিই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য যে, প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য, কেউই সত্যিকারভাবে নিরস্ত্রীকরণ কামনা করেন না এবং প্রত্যেকেই নিরস্ত্রীকরণের জন্যে যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণে বাহ্যতঃ উদগ্রীব যদিও তা সফল করার প্রচেষ্টায় কারো আন্তরিকতা নেই।

আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করার জন্যে বহুদিন ধরে আলাপ আলোচনা চলছে। মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে হয়তো বা শেষ পর্যন্ত আলোচনা সফল হবে। কিন্তু এক পক্ষ কিংবা আরেক পক্ষ সব সময়ই এমন ধরনের বিতর্ক-মূলক বিষয় উপস্থাপিত করেছে যে চুক্তি সম্পাদন কোন ক্রমেই হয়ে উঠেনি। এখনো চুক্তিবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু একথা বলা যায় না যে, উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি আশাপ্রদ। সাধারণতঃ ব্যর্থতার সমস্ত দোষই সোভিয়েত রাশিয়ার উপরে বর্তানো হয়ে থাকে।

আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে দুটো প্রয়োজনীয় বিষয় প্রণিধানযোগ্য—প্রথমতঃ এর ফলে আণবিক অস্ত্র নতুন শক্তিসমূহের মধ্যে বিস্তৃতির পথকে রোধ করবে; অপরপক্ষে, শান্তিকালীন অবস্থায় অনিষ্টকর তেজস্ক্রিয়ার সমাপ্তি হবে। তেজস্ক্রিয় ভস্ম বা 'ফল আউট' বিভিন্ন ধরনের হয়। সম্ভবতঃ 'স্ট্রনশিয়াম-৯০' এবং 'কার্বন-১৪' এগুলোর মধ্যে অন্যতম। উঁচু স্তরের বায়ুমণ্ডল থেকে বৃষ্টি কিংবা বাতাস যে সমস্ত তেজস্ক্রিয় ধূলা পৃথিবীতে নিয়ে আসে এর মধ্যেই 'আণবিক ভস্ম'-এর উৎপত্তি হয়। ক্ষেত্র-বিশেষে মাধ্যাকর্ষণের শ্লথ গতিতে ঐ সমস্ত বস্তু পৃথিবীতে চলে আসে। ঐসব নানা ধরনের দুরবস্থার জন্যে দায়ী। এর মধ্যে হাড় ক্যান্সার, ব্লাড ক্যান্সার,

BanglaBook.org

প্রজনন শক্তির বিনষ্ট হওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। যেহেতু এ সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায়শঃ সংঘটিত হয়, সেহেতু এমন ধরনের বিশেষ কোন অবস্থাকে আণবিক ভস্মের জন্যে পুরোপুরি দায়ী করা সম্ভব নয়। তবে এ কথাটা স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ ছাড়া আর সকলেই হয়তো স্বীকার করবে যে, ১৯৫৮ সনের আণবিক বিস্ফোরণ ক্যান্সারে মৃত্যু এবং বিকলাঙ্গ শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। বিভিন্ন সরকার ক্যান্সার রোগ দমনের গবেষণার জন্যে কিছু পরিমাণ টাকা ব্যয় করেছেন; কিন্তু এই রোগের উৎপত্তির জন্যে যা ব্যয় করা হচ্ছে তার পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত বেশী। প্রজনন প্রক্রিয়ার ব্যাপারে বংশানুক্রমিক ধারা সংক্রান্ত আমেরিকান বিশেষজ্ঞ A. H. Sturtevant-এর মতামত আমি নিম্নে উদ্ধৃত করছি "এই সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে গত্যন্তর নেই—পূর্বেই বিস্ফোরিত আণবিক বোমা পরিণামে বিকলাঙ্গ ব্যক্তি বিশেষের জন্মের জন্যে দায়ী হবে যদি মানবজাতি বংশপরম্পরা বেঁচেও থাকে, পরিতাপের বিষয় যে 'এডমিরাল স্ট্রাউস'-এর মতো বিচক্ষণ ও দায়িত্ববান কর্মচারীও মনে করেন যে, স্বল্প-পরিমাণ উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন তেজস্ক্রিয়া কোন প্রকার দৈহিক বিপর্যয়ের সূচনা করবে না।"

কিছু দিন না যেতেই তিনি আবার সাধারণ সভার অভিভাষণে মন্তব্য করেন যে, ১৯৫৪ সনে প্রথম বার আণবিক বিস্ফোরণের বছরে যে সমস্ত শিশুর জন্ম হয়েছিল তাদের মধ্যে প্রায় ১৮০০ শিশু তেজস্ক্রিয় আক্রান্ত হয়েছিল। সে বছরেই আমেরিকার উদ্ভিদ বিশেষজ্ঞ কার্ট স্টার্ন ঘোষণা করেছিলেন, "এ যাবৎ বিশ্বের সকলেরই দেহে কিছু না কিছু পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তু প্রবেশ করেছে—স্ট্রনশিয়াম রয়েছে হাড়ে ও দাঁতে আর 'আইওডিন' রয়েছে কণ্ঠনালীর হাড়ে।" (Brighter Thousand Suns দ্রষ্টব্য) কিভাবে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা নৈতিকতাবোধকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তা পর্যবেক্ষণ করা একটা বিরাট সমস্যা—সাথে সাথে নৈরাশ্যকর তো বটেই। স্বেচ্ছায় যদি আমি বিশেষ কোন ব্যক্তির 'ক্যান্সার'-এর কারণ ঘটাই তাহলে আমি জঘন্য জীব বলে বিবেচিত হব; কিন্তু যদি আমার অপকর্মের ফলে কয়েক হাজার লোক এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তাহলে আমাকে মহান দেশ-প্রেমিক বলে মনে করা হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত প্রজনন ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে এমন সব বস্তু যা বংশানুক্রমিক হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যে ব্যক্তি এমন অনিষ্টকর প্রভাবে

BanglaBook.org

নিপতিত হয়েছেন, সৌভাগ্যক্রমে হয়ত তার স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্ম হতে পারে, কিন্তু এদের শরীরে সঞ্চিত ঐ রোগের চিহ্ন হয়ত ওদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে বিস্তারিত হবে। আণবিক পরীক্ষায় কত লোকের প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্ট হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত হিসেব প্রকাশিত হয়েছে তা রাজনৈতিক মতবাদের প্রভাবে পড়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রজনন ক্ষমতার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আণবিক যুদ্ধে এ ধরনের ক্ষতি বিপুল আকার ধারণ করবে। বিচ্ছিন্ন লোকালয় শুধু জঘন্য চেহারাসম্পন্ন অথর্ব ও বোকাদেরই বংশধারা বাঁচিয়ে রাখবে এবং এ ধরনের সম্ভাবনায় আনন্দ পেতে পারে একমাত্র ঐসব ব্যক্তিরাই—যারা নির্লিপ্তচিত্তে আণবিক বিস্ফোরণের ধ্বংসলীলা নিয়ে ভাবতে পারে।

'তড়িৎ গতিতে প্রতিশোধ' নেয়ার মতবাদ পাশ্চাত্য জগতে সাম্প্রতিক কালে আলোচনা হচ্ছে। প্রাচ্যেও এর কিছুটা প্রভাব আছে বৈকি। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব জোরালো যুক্তিও উপস্থাপিত করা হয়। এ বিষয়টার উৎপত্তি স্থল হচ্ছে 'পার্ল হারবার' ধরনের অপ্রত্যাশিত আক্রমণকে কেন্দ্র করে: যে পক্ষ প্রথমেই তা করতে পারবে সুবিধাটা তাদেরই বেশী এবং প্রতিপক্ষকে যদি পুরোপুরি বিপর্যস্ত হতে না হয় তাহলে কালবিলম্ব না করে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি পক্ষই মনে করে যে, অপর পক্ষ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে প্রত্যেকেরই প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে পাল্টা আক্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থা নিরূপণের জন্যে। পাশ্চত্য-প্রাচ্যের চেয়ে এর বেশী কি করেছে তা আমরা জানি। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপকতর ও বিরাট 'রাডার' ব্যবস্থা রয়েছে। 'রাডার' সমূহ প্রতিটি মুহূর্তে সোভিয়েত বোমারু বিমান ও 'মিসাইল'-এর গতিবিধি পর্যবেক্ষণে নিয়োজিত। যে মুহূর্তে রাডার যন্ত্রপাতি ঐ ধরনের সোভিয়েত অস্ত্রের সংকেত পায়, তখনই আমেরিকান উদযান বোমা রাশিয়ার পথে এগিয়ে যেতে শুরু করে। প্রায়ই ত্রুটিও দেখা যায়, কোন কোন সময়ে অতিকায় পাখীর বিচরণকে, এমনকি কমপক্ষে একবারের জন্যে হলেও, চাঁদকে রাশ্যান মিশাইল বলে ভুল করা হয়েছিল। সতর্কতার সংকেত দেওয়ার সাথে সাথে বোমারু বিমানগুলো নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যায়। যথাসময়ে ভুল ধরা পড়ে এবং বোমারু বিমান-

BanglaBook.org

বহর পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এ ধরনের মারাত্মক ভুলের পুনরাবৃত্তি যে ভবিষ্যতেও হবে না-কে বলতে পারে? আর যদি তা সত্যিই ঘটে, তাহলে সারা বিশ্ব অযাচিত আণবিক ধ্বংস-প্রক্রিয়ার শিকার হবে। বিশেষ কোন মাসে হয়ত এর সম্ভাবনা কম, কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তা বেড়েও যেতে পারে। তাছাড়া স্নায়ুযুদ্ধের পাঁয়তারা তো চলছেই। ফলে, এর সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। যতদিন 'তড়িৎগতিতে প্রতিশোধ' নেয়ার চিন্তাধারা বিরাজ করবে, আজ হোক কিংবা কাল হোক, হয়ত শুধু ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতা ছাড়া আমাদের বাঁচবার পথ নেই। আণবিক নিরস্ত্রীকরণের সপক্ষে সম্ভবতঃ এটাই হচ্ছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যুক্তিসমূহের অন্যতম।

বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে যাদের হাতে উদ্‌যান বোমা নেই তাদেরকে উদযান বোমার অধিকারী করা স্পষ্টতই আপত্তিকর। কেননা এর ফলে আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকেই শুধু নিশ্চিত করে তোলা হবে। সবাই তা জানে, তবু কার্যকরী কোন ব্যবস্থা আজো গৃহীত হয়নি। প্রাথমিক স্তরে শুধু যুক্তরাষ্ট্রই আণবিক মারণাস্ত্রের অধিকারী ছিল। তারপরে পর্যায়ক্রমে রাশিয়া ও গ্রেটবৃটেন এর অধিকারী হয়। এখন খুব সম্ভব ফ্রান্সও আণবিক শক্তিসমূহের মধ্যে পরিগণিত। অদূর ভবিষ্যতেও চীনও এর অধিকারী হবে। তারপরে হয়ত দেখা যাবে যে ছোট ছোট শক্তিসমূহও এই মারণাস্ত্রের অধিকারী হয়ে গেছে।

এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই যে কোন দু'টো ছোট শক্তি সারা বিশ্বের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বলতে দ্বিধা নেই যে, এই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির কথা সবাই জানে, কিন্তু তা প্রতিরোধ করার জন্যে আজো কিছু করা হয়নি।

এ যাবত উদযান বোমাই হচ্ছে গণহত্যার সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র; কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, আন্তর্জাতিক অরাজকতা ও বৈজ্ঞানিক পারদর্শিতা যদি এভাবে এগিয়ে যেতে থাকে তাহলে এর চেয়েও বিপজ্জনক মারণাস্ত্র শীঘ্রই আবিষ্কৃত হবে। কেয়ামত-এর যন্ত্র বা **'Doomsday Machine'** নিয়েও সাম্প্রতিক কালে কথাবার্তা শোনা যায়। এটা এমন ধরনের যন্ত্র, যার সাহায্যে একটি মুহূর্তে বিশ্বের সমস্ত জনপদসমূহকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে। হারম্যান কাহ্‌ন বিবরণ দিয়েছেন যে, যদি তিনি তা সময়োপযোগী মনে করেন তাহলে প্রায়

BanglaBook.org

নিশ্চিতভাবেই ঐ ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারতেন; কিন্তু এখনো সৌভাগ্যতা আবিষ্কার করা বাঞ্ছিত বলে মনে তিনি করছেন না। কোন সন্দেহ নেই, যদি তা আবিষ্কার করার পদ্ধতি কারো জানা থাকতো, গোঁড়ামী-সম্পন্ন কোন কোন জাতি হয়ত সম্ভাব্য পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে নিঃসংকোচে তা ব্যবহার করতো। আমার ধারণা, হিটলার পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে হয়ত বা মনুষ্যজাতির শেষ পরিণতি পছন্দ করতেন।

চরম ধ্বংসলীলার যন্ত্রটার কথা ছেড়ে দিলেও, আরো অন্যান্য সম্ভাবনার বিষয়াদি রয়েছে যা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন। রাসায়নিক ও জীবাণু-যুদ্ধ এখনও উদযান বোমার মত কার্যকরী পন্থা বলে বিবেচিত হয় না; কিন্তু সমস্ত বৃহৎ শক্তিসমূহ এটাকে সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত এবং এ ব্যাপারে শীঘ্রই সাফল্যলাভ করবে বলেও অনুমান করা হচ্ছে।

আরেকটা সম্ভাবনা যার গুরুত্ব অপরিসীম তা হচ্ছে উদযান বোমা বহনকারী মনুষ্যচালিত কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ। কল্পনা করুন, আমেরিকা ও রাশিয়ার অজস্র কৃত্রিম উপগ্রহে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটা আকাশ পরিসীমার কথা এবং যেখানে প্রতিদিন অন্ততঃ একবার ওগুলো বিচরণ করছে যার প্রতেকটি মারাত্মক আঘাত হান্‌বার ক্ষমতা রাখে। এ রকম অবস্থায় জীবন ধারণ কি সম্ভব? মানুষের স্নায়ুতন্ত্রী তা সহ্য করতে পারবে? বিশ্বব্যাপী এই আতঙ্কাবস্থায় তিলে তিলে মরার চেয়ে যদি মানুষ সহসা ধ্বংসকে বেছে নেয় এতে কি আশ্চর্য হওয়ার কিছু আছে? মানব জাতির অদৃষ্টে কি আছে আমি জানি না, কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, একটা ব্যাপকতর পরিবর্তন সাধিত না হলে বিজ্ঞানের আশীর্বাদপুষ্ট মানবজাতির চরম ধ্বংস ছাড়া আর কোন পথ নেই। মানুষের জীবনধারায় মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়ার সুষ্ঠু ও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে এবং আজ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সংকট-মুহূর্তে এ ধরনের প্রবৃত্তি শুধু মাতলামীকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। আমরা যদি বাঁচতে চাই, এ ধরনের অবস্থাকে প্রতিরোধ করতেই হবে। আলোচনার বাকী অংশে আমি বোঝাতে চেষ্টা করবো কী পথে আমাদের মুক্তি এখনো সম্ভবপর।

BanglaBook.org

চতুর্থ অধ্যায়

মৃত্যু, না মুক্তি ?

আমেরিকান দেশপ্রেমিক প্যাট্রিক হেন্‌রী স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে যা বলেছিলেন তা সবাই অকুণ্ঠচিত্তে স্মরণ করে। তা হোল—হয় আমাকে মৃত্যু দেবে, নতুবা দেবে স্বাধীনতা। গোঁড়া অকম্যুনিস্ট ব্যক্তিগণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আলোচ্য বাণীটিকে শ্লোগান হিসাবে ব্যবহার করে এবং বোঝাতে চায় যে কম্যুনিস্ট পৃথিবী মেনে নেওয়ার চেয়ে মনুষ্য শূন্য পৃথিবীই অধিক বাঞ্ছনীয়। প্যাট্রিক হেন্‌রী যা বোঝাতে চেয়েছিলেন এর অর্থ সম্বন্ধে প্রায়ই ভুল করা হয়।

বৃটিশদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে একটা মহান দাবীকে তিনি সমর্থন যুগিয়েছিলেন। আর এ দাবী প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অসংখ্য আমেরিকান নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। ফলে, প্যাট্রিক হেন্‌রীর মৃত্যু হয়ত স্বাধীনতার দাবীকে আরো জোরদার করত। আর এমতাবস্থায় তাঁর শ্লোগানের যুক্তিবত্তা সহজেই স্বীকার করে নেওয়াই ছিল ন্যায্য ও সঙ্গত। এ শ্লোগান যদি আণবিক যুদ্ধের সপক্ষে হয় তাহলে এ অবস্থাটা দ্বিতীয় চিন্তার অবকাশ রাখে। আণবিক যুদ্ধের পরিণাম কি হতে পারে তা আমাদের অজানা। তা মনুষ্য জাতির চরম ধ্বংসও হয়ত ঘটাতে পারে। অথবা হয়ত এমনও হতে পারে যে, এর ফলে একদল বিচ্ছিন্ন অরাজকতাপূর্ণ লুটেরাদের দল সামাজিক সংহতিলুপ্ত পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। আবার এও হতে পারে যে, অত্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায়ও কঠিন স্বৈরতন্ত্র ও দৈনন্দিন জীবনের আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সুদৃঢ়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতাধীন থাকবে। হেন্‌রী কাহ্‌ন-এর মত বিজ্ঞানী যিনি বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আণবিক ধ্বংসলীলার পক্ষপাতি তিনিও স্বীকার করেছেন যে, যুদ্ধের ফলে পরিণামে সৃষ্টি হবে 'Disaster Socialism বা ধ্বংসকামী সমাজতন্ত্রের। একটা বিষয় যা আণবিক যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ

BanglaBook.org

করতে অক্ষম, তা হচ্ছে 'সুশৃঙ্খল স্বাধীনতা' যা হেনরী নিজে চেয়েছিলেন এবং যা তাঁর অনুসারিগণ বুঝাবার জন্যে মিথ্যে প্রয়াসে নিয়োজিত। কোন একটা উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করা প্রশংসনীয় হয় যদি উদ্দেশ্যটা মহৎ হয়; আর এর ফলে যদি তাকে প্রতিষ্ঠা করানো সম্ভবপর হয়। যদি সুনিশ্চিত হওয়া যায় যে, আপনার মৃত্যু কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে, তাহলে তা' গোড়ামি ছাড়া আর কিছু নয়। এ ব্যাপারে বিশেষভাবে ওদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা মনে করে যে কম্যুনিজমের বিজয়ের চেয়ে মানব সমাজের ধ্বংসই অধিকতর শ্রেয়ঃ অথবা যারা মনে করে কম্যুনিজম বিরোধী পক্ষের কৃতকার্যতা মানব সভ্যতা ধ্বংস করে হলেও রোধ করতে হবে। যদি আমরা কম্যুনিজমের মারাত্মক শত্রুদের সাথে একমতও হই যে এটা একটা অত্যন্ত খারাপ ব্যবস্থা। তথাপি পর্যায়ক্রমে কয়েকটি যুগেও উন্নততর কিছু একটার আশা আমরা করতে পারিনে। তাছাড়া, স্ট্যালিনপন্থীদের মত কম্যুনিজম বিরোধীদের ধ্বংস কামনা করেও বড় রকমের কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বহু ভয়াবহ অত্যাচার আর অবিচারের কাহিনী। কিন্তু কালের স্রোতে হয় এগুলো পরিশোধিত হয়েছে কিংবা মিলিয়ে গেছে ধ্বংসের অতলতলে। মানুষ যদি বেঁচে থাকতে পারে, উন্নতিও সম্ভবপর হবে। কম্যুনিজম কিংবা কম্যুনিজম বিরোধী মতবাদ কোনটাই পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠতে পারে না।

যারা 'মুক্ত-পৃথিবী' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এবং কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, নিজেদের অনুসৃত পন্থার বাস্তবায়নের যথেষ্ট আন্তরিকতাবোধের পরিচয় দেয়নি। বৃটিশ সরকার সম্প্রতি নিজের আদর্শকে পরিত্যাগ করে পর্তুগালের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে। যদিও পর্তুগাল পাশবিকভাবে এঙ্গোলার অশ্বেতাঙ্গ জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখার ব্যাপারে সর্বস্ব পণ করেছে। স্পেন ফ্রাংকোর শাসনাধীনে রাশিয়ার মতই ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে। তথাপি পাশ্চাত্য সম্ভবপর সমস্ত উপায়েই এর সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে উদগ্রীব। ইঙ্গ-ফরাসীদের সুয়েজ অভিযান কোনক্রমেই রাশিয়ানদের হাঙ্গেরীর বিদ্রোহ দমনের চেয়ে কম দোষাবহ নয়। অবশ্য, সুয়েজ অভিযান তুলনামূলকভাবে কোন ক্ষতিই করতে পারেনি। তা ছিল নিতান্তভাবেই এক ব্যর্থ অভিযান। কিউবা, গুয়েতামালা ও বৃটিশ গায়েনা'য় পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ তথাকার জনগণের

BanglaBook.org

আশা-আকাঙ্খাকে দাবিয়ে রাখার সংকল্প নিয়ে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করেছে। কেননা, নিজেদের দলে এদেরকে জোর করে ধরে রাখার প্রয়োজন পাশ্চাত্যের ছিল। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিজমের সদস্যপদ বেআইনী অপরাধ বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য যারা কম্যুনিজমকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ বলে মনে না করেই সদস্যপদ গ্রহণ করেছে বলে প্রমাণিত হয় ওদের ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হয় না। আমরা মনে করি এসবই হচ্ছে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মহাঅপরাধ। যতবেশী পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে, ততবেশী এ ধরনের অপরাধকে স্বাধীনতার নামে প্রয়োজন বলে বিবেচনা করা হবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করার প্রচেষ্টা ও প্রচার যন্ত্রের মিথ্যা কারসাজি পাশ্চাত্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। কিন্তু সাধারণতঃ বাইরের লোকের পক্ষে সেসব জানা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম্পর্ক সহজ করার জন্যে যে তা দরকার এমন কথাও স্বীকার করা হয় না। অথচ দাবী করা হয় যে, পাশ্চাত্য হচ্ছে 'মুক্ত অধিকারের পৃথিবী!'

উদাহরণস্বরূপ বৃটেনে অবস্থিত আমেরিকান ঘাঁটিসমূহের কথা একবার ভেবে দেখুন। কয়জন মানুষ জানে বৃটেনের প্রত্যেকটি নাগরিকের মধ্যে আমেরিকান বৈমানিকদের একটা শক্ত ব্যূহ বিদ্যমান যারা যে কোন জরুরী পরিস্থিতির জন্যে সর্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টি রাখে? এবং এরা এত উঁচুদরের ট্রেনিং-প্রাপ্ত যে দু'এক মিনিটের মধ্যেই বিমানসহ আকাশযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এ খবরটাই বা কয়জনের জানা আছে? এ সমস্ত গোপন আড্ডা-গুলোর একটার সাথে অপরটার কোন যোগাযোগ রাখা হয় না। এগুলোর প্রত্যেকটির নিজস্ব লাইব্রেরী মেস ও সিনেমা হল রয়েছে। প্রত্যেকটির দরজায় সশস্ত্র প্রহরী থাকে যেন এক শিবিরে কোন কর্মচারী আর এক শিবিরে প্রবেশ করতে না পারে। দু'এক মাস অন্তর প্রত্যেকটি বাহিনীকে তাদের সেনাপতিসহ আমেরিকায় প্রেরণ করা হয় এবং এদের স্থলে নতুন বাহিনী পাঠানো হয়। এদের ব্যাপারে এত বেশী গোপনীয়তা বজায় রাখা হয় যে, এক শিবিরের লোক অন্য শিবিরের লোকদের কোন খবরই জানে না।

এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পেছনে শুধু একটা উদ্দেশ্যই রয়েছে এবং তা হচ্ছে বৃটিশ নাগরিকদেরকে এসব সাজ-সরঞ্জামের বিষয়ে কোন কিছু জানতে না দেওয়া এবং শিবিরের সশস্ত্র বিমান বাহিনীর লোকদেরকে পুরোপুরিভাবে যন্ত্রচালিত করা। শুধু তাই নয়, তাদেরকে যে সমস্ত খবর জানতে দেয়া

BanglaBook.org

হয়, তাই শুধু এরা জানে। এদের প্রতি আদেশ আসে 'গ্রুপ' কমাণ্ডারের নিকট থেকে নয়—সোজাসুজি ওয়াশিংটন থেকে। হয়তো একদিন এমনও হতে পারে যে, ওয়াশিংটন থেকে আদেশের দরুন এদের কার্যকলাপের ফলে রাশিয়ান বাহিনী প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে এবং এক ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ধূলোয় মিলিয়ে যাবে। সরকারী সংস্থাগুলোর ক্ষমতা যে কত ব্যাপক, বিশেষ করে আমেরিকার ক্ষেত্রে তা কত বেশী প্রযোজ্য, এর প্রমাণ পাওয়া যায় ক্লড ইথারলি-এর ব্যাপারে, যিনি হিরোশিমায় আণবিক বোমা বর্ষণের সংকেত দিয়েছেন। ইথারলির কার্যকলাপ আরো একটা সত্যকে উন্মোচন করে দিয়েছে এবং তা হচ্ছে এই যে, শুধু আইন অমান্যের মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষের মারাত্মক অপরাধ সংঘটন থেকে রেহাই পেতে পারে। হিরোশিমা আণবিক আক্রমণের ফলে কত সাংঘাতিক ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারে, এ ব্যাপারে ইথারলিকে কোন ধারণাই দেওয়া হয়নি। তারপরে তিনি যখন আণবিক বোমার ধ্বংসলীলা সম্বন্ধে সম্যকজ্ঞান অর্জন করলেন তখন তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে তিনি আণবিক বোমার মারাত্মক ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের প্রচেষ্টায় আইন অমান্য আন্দোলনে বহু দিন যাবত অংশ গ্রহণ করেছেন। অবশ্য যে অপরাধের জন্যে তিনি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করছিলেন সে জন্যে তিনি নিজে কতখানি দায়ী ছিলেন তা ভেবে দেখা দরকার। কেননা নির্দেশিত দায়িত্ব পালন না করে তার পক্ষে অন্য কোন উপায় ছিল না। কর্তৃপক্ষ তাকে 'মাতাল' সাব্যস্ত করতে স্থির করলেন এবং এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে মনস্তাত্ত্বিকদের সমর্থন যোগানোও অসম্ভব হয়নি।

ইথারলি অনুতপ্ত হয়েও 'মাতাল' বলে আখ্যায়িত হলেন। ট্রুম্যান স্বীয় কার্যের জন্যে অনুতপ্ত হলেন না অথচ 'মাতাল' বলে পরিচিত হওয়ার অভিশাপ থেকে বেঁচে গেলেন। আমি ইথারলির প্রদত্ত বহু বিবৃতি দেখেছি। আমার মনে হয় ওগুলো নিঃসন্দেহে তার সুস্থ বিচারবুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু প্রচার যন্ত্রের ক্ষমতা এত বেশী যে প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতো যে তিনি একজন মাতাল এবং সে বিশ্বাস থেকে আমি নিজেও বাদ যাইনি।

মাত্র কিছু দিন আগে ইথারলিকে নিয়ে সংবাদপত্রে বেশ হৈ চৈ হয়। ফলে, ওয়াশিংটনের এটর্নি জেনারেল ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার জন্যে

BanglaBook.org

উদগ্রীব হয়ে উঠেন। ইখারলিকে অস্বাভাবিক নিরাপত্তার কড়াকড়ি থেকে সরিয়ে হাসপাতালের সুস্থ পরিবেশের অংশে স্থানান্তরিত করা হয়, যেখানে তাকে প্রচলিত ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর সুবিধা দান করা হয় এবং আশ্বাস দেয়া হয় যে, নতুন কোন শুনানি থেকে তাকে রেহাই দিয়ে অচিরেই মুক্ত করে দেয়া যাবে। মুক্তি তাকে দেয়া হয়নি। অবশ্য মুহূর্তের জন্যে মুক্ত পরিবেশের ছোঁয়া তিনি পেয়েছিলেন।

এখন বিবেচনা করে দেখুন, হাউস কমিটি আমেরিকান স্বার্থের পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্যে কি ধরনের তদন্ত করে থাকে। কমিটির অপছন্দ কোন বৃদ্ধলোককে যদি এর সামনে নিয়ে আসা হয় তাহলে অনেকটা নিম্নে উদ্ধৃত ধরনের কথাবার্তা সাধারণতঃ হয়ে থাকে:

প্রশ্ন: ত্রিশ বছর আগে ছাত্রাবস্থায় কোন কম্যুনিস্টদের আপনি জানতেন কি?

উত্তর: জি, হ্যাঁ।

প্রশ্ন: ওদের নাম দেওয়া সম্ভব হবে কি?

উত্তর: দুঃখিত! সম্ভব নয়।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে আনীত এ হতভাগ্য লোকটিকে তখন কংগ্রেস-এর প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানোর অভিযোগে জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ধরনের অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার দুটোই সম্ভাব্য পথ রয়েছে—হয় কমিটির প্রশংসা অর্জনের জন্যে বন্ধুদের নাম বলে দিতে হবে নতুবা এবং তাই প্রত্যাশিত, তাকে কতকগুলো মিথ্যা অভিযোগ আবিষ্কার করতে হবে বন্ধুদের বিরুদ্ধে। এ ধরনের বিধান স্বাধীনতার পবিত্র নামে সংগত বলে ধরে নেয়া হয়।

যা বলছিলাম এগুলো রাশিয়াকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যে বলিনি। হাঙ্গেরী পূর্ব জার্মানীর নিপীড়িত মানুষের প্রতি রাশিয়া জঘন্য ধরনের ঘৃণা ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। পাশ্চাত্যের অবিমৃষ্যকারিতার অপবাদ থেকে রাশিয়া এখন আর মুক্ত নয়। রাশিয়ার সামরিক ক্ষমতার দাপটে সৃষ্ট পূর্ব-জার্মানীর সরকারকে বলা হয়ে থাকে 'জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'। কিন্তু পূর্বজার্মানীর অপরাধে অভিযুক্ত হওয়ার অর্থ এ নয় যে পশ্চিম জার্মানী নিষ্পাপ। সুনির্ধারিত যুক্তি উভয় অংশেই রয়েছে এবং তা উভয় অংশের বেলায়ই সমপরিমাণে বিরক্তিকর।

BanglaBook.org

পারমাণবিক মারণাস্ত্রের একটা ভয়ংকর দিক রয়েছে। যদি কোন কারণে ব্যাপক আকারে সংঘাত বেঁধে যায় তাহলে শুধু আক্রান্ত জাতিসমূহ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এদের সাথে সাথে নিরপেক্ষ জাতিসমূহও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতএব, নিরপেক্ষদেরও নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা রোধ করার মৌলিক অধিকার রয়েছে। বিদেশী শক্তির প্রতিকূলতায় নিজস্ব সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্যে বিশেষ কোন জাতির যে অধিকারই থাকুক না কেন, বিচারের কোন মাপকাঠিতেই তা নিরপেক্ষ কোন দেশের লক্ষ লক্ষ জীবন ধ্বংস করার কারণ ঘটানোর অধিকার নেই। আমরা অনেকেই কম্যুনিজম সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নই; কিন্তু এর জন্যে ভারত ও আফ্রিকার অসংখ্য মানুষ যারা একাকী চলতে চায়—এদের উপরে মৃত্যুর বিভীষিকা টেনে দেয়া কিভাবে মেনে নেয়া যেতে পারে? তাকে কি গণতন্ত্র বলে স্বীকার করা যাবে? গণতন্ত্রের দাবী কি তা নয় যে যারা নিরপেক্ষ থাকতে চায়—তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সংঘর্ষে তাদেরকে জড়ানো যায় না?

ধরা যাক, বার্লিন সমস্যার কথা। বেদনাহত হৃদয়ে আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমেরিকা ও রাশিয়া উভয়ই আণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করছে অথচ নিজেদের অপছন্দ কোন সমাধানের পথই এরা মেনে নেবে না। এ ধরনের উক্তি, যা সারা বিশ্বের আতঙ্কের কারণ, তা সত্যিই অসহ্য। আর শুধু অতি নাটকীয়তার ক্ষেত্রেই তা মানায়। ক্রেমলিন ও ওয়ালস্ট্রীট-এর নষ্টামি উভয় অংশের গোঁড়াদের মনে সাড়া জাগিয়ে তোলে এবং এর ফলে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের বেলায় এরা আপোষহীন—অন্ধ। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর সমঝোতার ব্যাপারে এরা যদি সুবুদ্ধিপ্রণোদিত হোত তাহলে পরস্পরকে কখনো শত্রু মনে করতো না। বরঞ্চ, উদযান বোমাকে নিজেদের সাধারণ শত্রু বলে বিবেচনা করতো। উভয়েরই একটা সম-স্বার্থ রয়েছে এবং তা আধুনিক অস্ত্রের ধ্বংসের হাত থেকে বিমুক্ত। উভয়েই সম-স্বার্থের ব্যাপারে অনড় এবং পরস্পরের প্রতি অসহনশীল। আপোষ-আলোচনায় এদের কারো কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছে নেই। এরা চায় যেন কূটনীতির জটাজালে একে অপরের বিজয়কে স্বীকার করতে না হয়। এ ধরনের পারস্পরিক শত্রুতার পেছনে রয়েছে কতকগুলো মানবিক প্রবৃত্তি আর সেগুলোর মধ্যে প্রধান হোল আত্মম্ভরিতা, সন্দেহ, ভয় ও ক্ষমতার

BanglaBook.org

প্রতি মোহ। যাঁরা মধ্যস্থতা করেন এরা, এমনকি যুক্তিসংগত কোন সুযোগ দানকেও প্রতিরোধ করার মাধ্যমে খুঁজে পায় আত্মতৃপ্তির আস্বাদ। উভয়-পক্ষের বর্তমান মেজাজ যদি অপরিবর্তনীয় থাকে, সে অবস্থায় সন্দেহ থাকা অস্বাভাবিক নয়। প্রতিটি পক্ষই অপর পক্ষ যা বলে তা মনে করে নিজেদের নির্দোষ মধ্যস্থকারীদের বিপথগামী করার শয়তানী ষড়যন্ত্র। আবার একই অবস্থায় ভয় থাকাটাও অমূলক নয়। ভীতি প্রায়ই অযৌক্তিক প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব করে—যা বিপদকে বাড়িয়ে তুলে এবং তাই আবার ভয়ের কারণ। প্রাত্যহিক জীবনের বেলায় ঘটেও তাই। মনস্তাত্ত্বিকেরা তা ভালোভাবেই জানেন। আতঙ্ককের শিহরণে অধিকাংশ মানুষই সুস্থভাবে চিন্তা করতে পারে না এবং পাশবিক ধরনে আন্দোলিত হয়।

আমার একটা খচ্চর ছিল। থাকতো বাইরের বাড়ীতে। একবার আগুন লেগে গেলো সেখানে। বেশ কয়েকজন বলবান লোক মিলে জোর করে টেনে ঘর থেকে এটাকে বাইরে নিয়ে আসে। ঐ অবস্থায় খচ্চরটাকে ছেড়ে দেয়া হলে আতংকের দরুন এটা গতি হারিয়ে ফেলতো এবং এর পুড়ে মরা ছাড়া আর কোন পথ থাকতো না। বৃহৎ শক্তিগুলোর বর্তমান অবস্থা প্রায় একই ধরনের। নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে এ কথাটা বিশেষভাবে খাটে। প্রতি-পক্ষই অপর পক্ষের পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জায় আতংকিত ও নিরাপত্তা খুঁজে নিজস্ব পারমাণবিক অস্ত্রক্ষমতা সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে। অপরপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই নতুনভাবে ত্বরান্বিত করে নিজের অস্ত্রসজ্জার প্রচেষ্টা। আর এভাবে পারমাণবিক বিপদ হ্রাস করার যাবতীয় ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে বরং সম্ভাবনাকেই বৃদ্ধি করে তুলে।

জাতীয় নীতি অযৌক্তিক পথে প্ররোচিত করার ব্যাপারে ভীতির চেয়ে ক্ষমতার মোহই অধিকতর শক্তিশালী। ব্যক্তিবিশেষের আস্ফালন আপত্তি-কর যদিও, জাতীয় পর্যায়েই তা আবার প্রশংসার্হ। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা বলছিনে। তবুও অন্ততঃ সমপর্যায়ের দেশপ্রেমিকের কাছে তা নিঃসন্দেহে আবেদনশীল। ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, শক্তিশালী জাতিসমূহের ধ্বংসের প্রধান কারণ ছিল নিজেদের ক্ষমতার পরিধি সম্বন্ধে স্বেচ্ছাকৃত উদাসীনতা। বিশ্ব বিজয়ের অলীক ধারণা ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর বহু জাতির ধ্বংসের পথকে করেছে প্রশস্ত। হিটলার আমলের জার্মানী হোল এর অতি সাম্প্রতিক উদাহরণ। সময়ের সূত্র ধরে আর একটু পিছিয়ে গেলে

BanglaBook.org

দেখা যাবে নেপোলিয়ান, চেঙ্গিস খান ও এটিলা এ ব্যাপারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যাঁরা জেনেসিস্ (Genesis) কে প্রামাণ্য ইতিহাস বলে মনে করেন এদের কাছে 'কেইন' হলো উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। 'কেইন'-এর ধারণা ছিল যে, 'এবেল'কে পথ থেকে সরাতে পারলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের শাসনের ব্যাপারটা তার সহজ হবে। ক্রুশ্চেভ যখন পাশ্চাত্যকে ধ্বংস করার ভীতি প্রদর্শন করেন এবং যখন ডালেস বলেন: 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমরা জয়ী হবো'—তখন অতীতের ঐ ধরনের ক্ষমতার কথা আমার স্মরণে আসে এবং এটা একটা মারাত্মক নির্বুদ্ধিতা—এমনকি ব্যক্তিস্বার্থের সংকীর্ণতম দৃষ্টিকোণ থেকেও। ধ্বংস, দুর্দশা, মৃত্যু, নিজের এবং শত্রুদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া উন্মাদের কার্যকলাপের নামান্তর। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য যদি পারস্পরিক শত্রুতা পরিহার করে নিজেদের মঙ্গলের জন্যে বিজ্ঞানের কলা-কৌশলে নিয়োজিত হোত তাহলে সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করা সহজতর হোত। তাছাড়া ভীতির বোঝা যা সর্বক্ষণ মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে তা ওদের নিজেদেরই বোকামির ফলশ্রুতি। কেননা নষ্টামির কেন্দ্রস্থল হচ্ছে মানুষেরই মন। আতংকের যে মারাত্মক যন্ত্র মানুষ তৈরী করছে তা নিছকভাবেই আমাদের—নিজস্ব অনিষ্টকর প্রবৃত্তির বাহ্যিক স্তম্ভ। অমানবিক পৃথিবীর কোন বস্তুই প্রচলিত সংঘাতের স্থান করে দিতে পারে না। সমস্ত বিপদের উৎসভূমি হচ্ছে মানুষের মন এবং মনের দিগন্ত প্রসারের মাধ্যমেই সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে।

কেউ কেউ বলেন: "যুদ্ধ হচ্ছে মানব প্রকৃতির একটা অংশ; আর মানব প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। যুদ্ধই যদি মানুষের ধ্বংস বুঝায় তাহলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতি স্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।" এমন ধরনের মন্তব্য ওরাই করে যাদের বিশ্বাস হচ্ছে অন্তঃসারশূন্য। অস্বীকার করবো না, এমন ধরনের ব্যক্তি ও জাতি রয়েছে যাদের কাছে অরাজকতা খুবই আবেদনশীল। কিন্তু এটা কখনো সত্য নয় যে, মানুষের প্রকৃতিতে এমন কিছু রয়েছে যা ঐ ধরনের মানুষ ও জাতিসমূহের অকল্যাণকর প্রচেষ্টা রোধ করা অসম্ভব করে তোলে। ফৌজদারী আইন ব্যক্তিবিশেষের নরহত্যার ইচ্ছাকে নিবৃত্ত করে। নরহত্যার ব্যাপারে বিধিনিষেধ থাকার ফলেই আমাদের অনেকের কাছে জীবনধারণ অসহ্য নয়। যুদ্ধবাজেরা অস্বীকার করে করুক—এ কথাটা নানা জাতির ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। ১৮১৪ সনের

BanglaBook.org

পরে আজ পর্যন্ত সুইডেন কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি। আমি দেখেছি, এ জন্যে কোন সুইডিশদের মনে কোন ব্যথা নেই। শান্তিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার বহু পথ রয়েছে যা অবহেলিত হওয়ার নয়। তা ছাড়া এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক উপজ্ঞা সহজেই পরিপূর্ণ হতে পারে। সভ্য দেশে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এমন ধরনের অবস্থার উদ্ভব করে যে, তা যদি বিভিন্ন জাতির মধ্যে হোত তাহলে যুদ্ধ বেজে উঠতো। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাজনীতিবিদরা আইনের নির্ধারিত বিধিনিষেধের সাথে পরিচিত। একই ধরনের অবস্থা আন্তর্জাতিক কার্যকলাপে সহজেই ঘটতো যদি বিরোধ নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে কোন প্রকার রাজনৈতিক যন্ত্রের অস্তিত্ব থাকতো এবং যদি মানুষ আইনের বিধি-নিষেধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার ব্যাপারে অভ্যস্ত হোত। বেশী দিনের কথা নয়, যখন ব্যক্তিগত বিরোধ নিষ্পত্তির পথ ছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ। যারা দ্বন্দ্বযুদ্ধের সমর্থক তাদের কাছে এর বিলোপসাধন মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বলে হয়ত বিবেচিত হোত। ওরা এবং বর্তমানে যারা যুদ্ধকে সমর্থন করে এরা ভুলে গিয়েছিল যে, 'মানব-প্রকৃতি' যাকে বলা হয় মূলতঃ তা হচ্ছে প্রচলিত অনুশাসন। সংস্কার ও শিক্ষার ফলশ্রুতি। অবশ্য সভ্য সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের কাছে তা আদিম প্রবৃত্তির পরিণতি বলে বিবেচিত। পৃথিবী যদি কয়েক যুগ যুদ্ধকে ছেড়ে চলতে পারতো তাহলে দ্বন্দ্বযুদ্ধের মতো যুদ্ধও অসম্ভব হয়ে উঠতো। সন্দেহ নেই, এর পরেও কিছু পরিমাণে নরহত্যার উন্মত্ততা থাকতো, তবে এর ফলে এরা সরকারসমূহের পরিচালনার দায়িত্ব অর্জনে সক্ষম হোত না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পঞ্চম অধ্যায়

উদযান বোমা ও বিজ্ঞানী সমাজ

সাধারণ মানুষের অনেকেই মনে করেন যে, বিশ্বকে পারমাণবিক ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত করার জন্যে নৈতিকতার দিক থেকে বিজ্ঞানীরাই দায়ী। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীদের বেলায় সঙ্গত কারণেই এ ধরনের অপবাদ অন্ততঃ আংশিকভাবে সত্য। কোন কোন দেশ আণবিক অস্ত্র তৈরীর কিংবা গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদেরকে নিয়োজিত করে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে এমন অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা হয়তো আণবিক বিপদের ঝুঁকি হ্রাস করার প্রচেষ্টায় সফল হতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, তাঁদের প্রচেষ্টা রাজনীতিবিদ, সংবাদপত্র, জনসাধারণের যথেষ্ট সমর্থন পায়নি—বরঞ্চ ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাপক প্রচারের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে এবং বর্তমান অধ্যায়ে বিজ্ঞানীদের এহেন প্রচেষ্টার কথা কিছু বলব। আমেরিকান সরকার যখন উদযান বোমা তৈরীর ব্যাপারে কাজ শুরু করার প্রস্তাব করে তখন ওপেনহাইমার যিনি আণবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারে একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন—তিনিও এ ধরনের নতুন পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে, তিনি মার্কিন সরকারের অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে নিপতিত হলেন এবং তার অনেক পুরনো ঘটনার একতরফা সুযোগ গ্রহণ করে ১৯৫৪ সালে জনমতকে বিভ্রান্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল যে, ওপেনহাইমার, 'নিরাপত্তার জন্যে বিপজ্জনক' কাজেই গোপনীয় তথ্যাদি জ্ঞাত হওয়ার অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন, যে আণবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারে সক্রিয় অথচ উদযান বোমার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকাটা বিজ্ঞানীদের কার্যকলাপে স্ববিরোধিতার লক্ষণ। মহাযুদ্ধের সময়ে আণবিক বোমা তৈরী হয়েছিল ভুলক্রমে অথচ সঙ্গত কারণের বশবর্তী হয়ে। আর ধারণাটা ছিল যে হিটলার হয়তো মারণাস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে প্রায় পুরোপুরি সফল

BanglaBook.org

হয়ে গিয়েছিলেন। উদযান বোমা তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয় শান্তিকালীন সময়ে। তখন এটা নিশ্চিত ছিল যে, আমেরিকানদের উক্ত বোমা তৈরীর সাথে সাথে হয়ত রাশিয়ানরাও এগিয়ে আসবেন এবং উভয়ের কারো পক্ষে বিজয়ের ব্যাপারে এটা কোন উপকরণ হিসাবে গণ্য হবে না।

ঐ সময়ে উদ্‌যান বোমার পরীক্ষিত ধ্বংস-ক্ষমতা উভয় দেশেরই বিজ্ঞানীদের মনকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। কাউণ্ট বার্নাদোত-এর উদ্যমে পাশ্চাত্যের বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী 'মেইনাউ' দ্বীপে একত্রিত হয়ে ১৯৫৫ সনের জুলাই মাসের পনেরো তারিখে নিম্নে বর্ণিত ইস্তাহার প্রচার করেছিলেন:

"আমরা যারা এ আবেদনপত্রে সই করেছি—আমাদের জাতি, ধর্ম ও বিশ্বাসের যথেষ্ট অমিল রয়েছে। তবুও নোবেল পুরস্কারের সম্মানে আমরা সবাই গর্বিত।

"সারাজীবন বিজ্ঞানের সাধনায় আমরা অতিবাহিত করেছি। কেননা, আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানব সমাজের পক্ষে পরিপূর্ণ জীবন-ধারণ সম্ভবপর। অথচ এ বিজ্ঞানই মানুষের নিজেদের ধ্বংসের কাজে সাহায্য করছে উপলব্ধি করতে পেরে আমরা সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সর্বাত্মক সমরে যদি প্রচলিত মারণাস্ত্রের প্রয়োগ করা হয় তাহলে সারা বিশ্ব আণবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থে ভরে যাবে এবং এর ফলে যুদ্ধে নিয়োজিত কিংবা নিরপেক্ষ যে কোন জাতির ধ্বংস স্বেচ্ছায় বরণ করা হবে।

"আমরা অস্বীকার করছিনে যে, বর্তমানকালে মারণাস্ত্রের ধ্বংসলীলার ভয়ে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা হচ্ছে। তথাপি আমরা মনে করি, কোন সরকারের পক্ষে এটা রীতিমত বিভ্রান্তিকর যদি ধরে নেয়া হয়, ভবিষ্যতেও এরা যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে দেখা গিয়েছে যে, ভয় ও উত্তেজনা নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধের জন্য দায়ী। এমনিভাবে এটাও বিভ্রান্তিকর যে, ছোটখাটো সংঘর্ষ সনাতন অস্ত্রের মাধ্যমে মীমাংসা করা যাবে।

"বিভিন্ন জাতিসমূহের অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে স্বপ্রণোদিত হয়ে বলপ্রয়োগ পরিহার করা হবে। আর তা যদি বিঘ্নিত হয় তাহলে সকলের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

BanglaBook.org

আণবিক যুদ্ধের বিপজ্জনক সম্ভাবনা হ্রাস করার ব্যাপারে যে সব বিজ্ঞানীরা উদ্যোক্তা এঁদের মধ্যে ডাঃ লাইনাস পলিং-এর প্রচেষ্টা সমধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি জাতিসংঘে প্রেরিত এক আবেদনপত্রে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্যে চুক্তিপত্র গ্রহণের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার মাধ্যমে আণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করা যেতে পারে। তাঁর তৈরী খসড়া—আবেদনপত্রে ৯২৩৫ জন বিজ্ঞানী স্বাক্ষর দান করেছিলেন এবং ১৯৫৮ সনে তিনি তা দাগ হ্যামার শোল্ডের কাছে পৌঁছিয়ে দেন। আলোচ্য আবেদনপত্রে তিনি জোরালো ভাষায় যা বলেছিলেন তা' হোল:

"নিম্নে স্বাক্ষরিত আমরা বিজ্ঞানীরা আবেদন করছি যেন এক্ষুণি আণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে বন্ধ করে দেয়া হয়।

"আণবিক বিস্ফোরণই তেজস্ক্রিয় পদার্থ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। ফলে, মানুষের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঘটে এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে অসংখ্য বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করবে।

"যতদিন শুধু তিনটি বৃহৎ শক্তির হাতে এ মারণাস্ত্র থাকবে ততদিন এটাকে চুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর। যদি বিস্ফোরণ পরীক্ষা অব্যাহত থাকে তাহলে অন্যান্য সরকারের হাতেও এটা এসে যাবে এবং এর ফলে একটা সর্বাত্মক ধ্বংসকারী যুদ্ধের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। অবশ্য দায়িত্বহীন কিছুসংখ্যক জাতীয় নেতার অসতর্ক কার্যকলাপই এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।

"আণবিক বোমার বিস্ফোরণ পরীক্ষা বন্ধ করার জন্যে এখন শুধু আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রণয়নই নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে। তাছাড়া পরিণামে আণবিক অস্ত্রের বিলোপ সাধন ও এর মাধ্যমে মানবতার মহাবিপর্যয়ের হাতিয়ার আণবিক যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রতিরোধ সফলতার সাথেই হতে পারে।

"অন্যান্য সকলের মতো আমরাও মানুষের কল্যাণ কামনায় উদ্‌গ্রীব। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিপদের ব্যাপারে আমরা পুরোপুরিভাবে সচেতন। সুতরাং সে সমস্ত বিপদ সম্বন্ধে সকলকে জানিয়ে দেওয়া আমাদের বিশেষ কর্তব্য বলেই আমরা মনে করি। আমাদের ধারণা, সর্বপ্রকার আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ পরীক্ষা আন্তর্জাতিক চুক্তির মাধ্যমে অচিরেই

BanglaBook.org

বন্ধ করা উচিত। ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে একটা রিপোর্ট প্রণয়ন করেছিলেন যার নাম ছিল—'আণবিক বিস্ফোরণ ও এর প্রতিক্রিয়া।' দিল্লীতে ১৯৫৬ সালে তা প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৮ সালে। এটা ছিল একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য রিপোর্ট। কিন্তু হলে কী হবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনীতিবিদদের কাছে তা ছিল মূল্যহীন। গরম গরম খবরের জন্য উন্মুখ সাংবাদিকদের কাছেও তা ছিল না আবেদনশীল: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কেউ জানলো না এ রিপোর্টের কথা।

"১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে পার্লামেণ্টারী এসোসিয়েশন ফর ওয়ালর্ড গভর্ণমেণ্ট-এর একটা জরুরী অধিবেশন শুরু হয় লণ্ডনে। এতে ছিল সোভিয়েত-এর চারজন প্রতিনিধি এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। এতে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন এঁরা শুধু বিভিন্ন দেশের পার্লামেণ্টের সদস্যরাই ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে ছিলেন—বৈজ্ঞানিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকেরা। সংস্থা এবং এর কর্মসূচী সংঘটন ও প্রণয়নে বিজ্ঞানীরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। অন্যান্য প্রতিনিধিদের মতো রাশিয়ানরাও যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ উদ্যম নিয়ে সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন; আর পশ্চিমী প্রতিনিধিরাও সমপরিমাণ বন্ধুত্বের সাথে তাঁদের আপ্যায়ন করেছিলেন। আলাপ-আলোচনার ধারায় এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছিল যে, যদি বিশ্বের বিভিন্ন কার্যকলাপ ঐ ধরনের কোন সংস্থার কাছে অর্পিত হোত তাহলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উত্তেজনা দ্রুততার সাথে প্রশমিত হতে পারতো এবং যে সমস্ত সমস্যা বিভিন্ন সরকারসমূহ এদ্দিন নিজেদের অপরিহার্য স্বার্থ-সংরক্ষিত করে সমাধান করতে পারেনি তা অচিরেই সমাধান হয়ে যেতো। আলাপ-আলোচনার সূত্রপাতেই আমি একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলাম এবং তা ছিল:

"যেহেতু ভবিষ্যতের যে কোন যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার অনস্বীকার্য এবং যেহেতু এমন ধরনের অস্ত্রসমূহ সভ্য সমাজেরই শুধু নয় বরং মনুষ্যজাতির অস্তিত্বের পথে মারাত্মক অন্তরায় সেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন সরকারসমূহের প্রতি আমাদের আবেদন ওরা যেন এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে সর্বসমক্ষে তা ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ ওদের কারো কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম নয়। কাজেই সমস্ত মানবতার জন্যে বিভিন্ন

BanglaBook.org

বিরোধ নিষ্পত্তি ও শান্তি অর্জনের পথকে প্রশস্ত করার জন্যে, আমরা অনুরোধ করছি যেন বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক উন্নতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অবিলম্বে পরীক্ষা করে দেখা হয়।"

এর সাথে আমার সংযোজন ছিল: "সম্মেলনের প্রারম্ভে আমার যে প্রস্তাব ছিল আলোচ্য প্রস্তাবে সঠিকভাবে তা গৃহীত হয়নি। মতানৈক্য যা ছিল তা আমাদের বন্ধুদের সাথে আলোচনার ফলেই হয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করে আমি আনন্দিত হয়েছি এবং এমন ধরনের প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করেছি যা আমাদের সকলেরই সমর্থন যুগিয়েছে। চুক্তি ও পারস্পরিক সম্মতি অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি আনন্দের সাথে লক্ষ্য করছি যে, আলোচ্য প্রস্তাবের খসড়া প্রণয়নে সোভিয়েত বন্ধুদের সমর্থন পাশ্চাত্য বন্ধুদের মতই রয়েছে। এটা হোল সহযোগিতার সূচনা এবং আমি আশা করি যে, ভবিষ্যতে তা ব্যাপকতর ও গভীরভাবে কাজ করে যাবে এবং এর ফলে বর্তমানের মতানৈক্য ও দলাদলি বিদূরিত হবে।"

মস্কো 'একাডেমী অব সাইন্স'-এর অধ্যাপক সি, এ গোলনস্কী আরো বলেছিলেন: "সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আলোচ্য প্রস্তাবটি সমর্থনের কথা আপনাদেরকে বলার জন্যে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি আনন্দের সাথে লক্ষ্য করছি যে, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ফলে স্টিয়ারিং কমিটি সর্বজনগ্রাহ্য প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহের কোন আইনানুগ এখ্তিয়ার নেই। এগুলোর গুরুত্ব শুধু নৈতিক চরিত্রের আওতাধীন। কিন্তু লক্ষ্য করার ব্যাপার হচ্ছে যে, প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতামতে গৃহীত হয়নি। তা গৃহীত হয়েছে সর্বসম্মতিক্রমে—যার মধ্যে রয়েছে উপস্থিত সকলের অনুভূতির প্রকাশ। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা পোষণ করি যে আলোচ্য প্রস্তাবটি আন্তর্জাতিক শান্তি ও বিশ্বের বিভিন্ন জাতিসমূহের নিরাপত্তা জোরদার করার জন্যে একটা বিশিষ্ট অবদান।

সোভিয়েত একাডেমী বিষয়ক সেক্রেটারী অধ্যাপক এ, ভি টপসিভ আলোচনার প্রাক্কালে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন:

"সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সম্মেলন নিঃসন্দেহে সফল

BanglaBook.org

হয়েছে। আগাগোড়াই সম্মেলনে পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্যম নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। কখনো আন্তরিকতার সাথে সর্বজনসম্মত চুক্তি গ্রহণ করার ব্যাপারে এতটুকু অন্যথা হয়নি। সম্মেলনের এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যে দু'টো প্রধান প্রস্তাবই ও কমিশনসমূহের সিদ্ধান্তগুলো একবাক্যে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের সম্মেলন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলের আন্তরিক সদিচ্ছা ও পরস্পরের মতামতের উপর শ্রদ্ধাবোধ থাকলে যে কোন প্রশ্নের সহজেই মীমাংসা সম্ভবপর। আমাদের সম্মেলনের আরেকটি সুনির্দিষ্ট দিক্ রয়েছে যে বিভিন্ন জাতির বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিজ্ঞানের উন্নতি বিধানের জন্যে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

অপরিসীম আগ্রহ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সম্মেলনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। ১৯৫৫ সালের প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ সময়টা ছিল আশাপ্রদ ও সম্ভাবনা-পূর্ণ। জুন মাসে হেলসিংকিতে বিশ্ব-শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও কম্যুনিস্টরাই ঐ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিল তথাপি অকম্যুনিস্টদের এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। এমনকি আমি নিজেও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। সম্মেলনে ব্যক্তিগতভাবে আমি উপস্থিত হতে পারিনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে আমার কয়েকটি শর্ত ছিল যা সম্মেলনের সকলেরই সমর্থন পেয়েছিল। ঐ সময়ের সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশ বিনষ্ট হয় পশ্চিমী সরকারসমূহের দরুন। রাশিয়া যখন অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবসমূহ পেশ নেয়, তৎক্ষণাৎ ওরা ওগুলো প্রত্যাহার করে। সাম্প্রতিক কালে ঠিক একই পদ্ধতিতে রাশিয়ানরাও পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করার চুক্তিগুলো শেষ পর্যায়ে বানচাল করে দেয়।

'পাগওয়াস মুভম্যাণ্ট'-এর সাথে আমি সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। এর মূলে ছিল আমার একটা বিবৃতি যার খসড়া আমি কিছুসংখ্যক অত্যন্ত খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়েছিলাম এবং এদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তিই ছিলেন আইনস্টাইন যিনি তার মৃত্যুর মাত্র দু'দিন আগে খসড়া বিবৃতিটিতে সই দিয়েছিলেন। আমার উদ্দেশ্য ছিল কম্যুনিস্ট এবং কম্যুনিস্ট-বিরোধী বিজ্ঞানীদের মধ্যে সহযোগিতার ব্যবস্থা করা। আমার

BanglaBook.org

ধারণা ছিল যে জীবিতদের মধ্যে বিশ্বের সর্বাধিক খ্যাতি ও ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমর্থনে আমার বিবৃতিটা বিভিন্ন জাতির সরকার ও জনসাধারণের উপরে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। আমি যখন মনে কোরলাম যে, যথেষ্ট সংখ্যক স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে পেরেছি তখন এক সাংবাদিক সভায় আমি আমার বিবৃতি প্রকাশ করি। 'অবজার্ভার'-এর একজন সাংবাদিক এ ব্যাপারে আমাকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেন। ১৯৫৫ সনের ৯ই জুলাই আমার সে বিবৃতি সর্বসাধারণ্যে প্রকাশিত হয় এবং এটা অত্যন্ত সুখের কথা যে, আলোচ্য সাংবাদিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক রটব্ল্যাট। ঐ বিবৃতিটির বিবরণ ছিল নিম্নরূপঃ

"মানব সভ্যতার এ দুর্যোগ মুহূর্তে আমরা মনে করি যে, বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে সম্মেলনের মাধ্যমে মারণাস্ত্রের উন্নয়নের ফলে সম্ভাব্য বিপদের ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দেয়া উচিত এবং আলোচনা করে অত্র সংশ্লিষ্ট খসড়াটির মত প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।

"এ মুহূর্তে আমরা যা বলছি তা বিশেষ কোন জাতি, দেশ কিংবা মতের প্রতিধ্বনি নয়—আমাদের একমাত্র পরিচয় যে আমরা মানুষ, যাদের অস্তিত্ব সংরক্ষণের ব্যাপারে আমরা সংশয়াপন্ন। পৃথিবী জুড়ে চলছে কলহ, সংঘাত। আর সবার উপরে রয়েছে এক মারাত্মক সংঘর্ষ—কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্টদের মধ্যে।

"রাজনীতি সম্বন্ধে সচেতন প্রায় প্রতিটি ব্যক্তিরাই এ ধরনের এক বা একাধিক সমস্যা নিয়ে রয়েছে গভীর প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে ঐ সব অনুভূতি আপনারা ছেড়ে দিন এবং আপনাদের নিজেদেরকে মনে করুন মনুষ্য নামধারী জীবসমূহের উত্তর-পুরুষ হিসাবে যাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্য ও ইতিহাস। আরো মনে করুন যে এদের বিলীন হয়ে যাওয়া আমাদের কারো কাম্য নয়।

আমরা এমন কথা বলবো না যা কোন বিভক্ত চিন্তার স্থান দিতে পারে। সমপরিমাণে প্রত্যেকেই বিপদের সম্মুখীন এবং এর অর্থ যদি পরিষ্কারভাবে বোঝা গিয়ে থাকে, তাহলে সকলেই তা মিলিতভাবে এড়িয়ে যেতে সমর্থ হবে।

নতুন পথে, নতুনভাবে, আমাদের চিন্তা করতে শিখতে হবে। আমাদের আরো শিখতে হবে—কিভাবে আত্মজিজ্ঞাসার আলোকে দলমত নির্বিশেষে,

BanglaBook.org

সামরিক বিজয়ের ব্যবস্থা বর্জন করতে পারি, কেননা এখন আর ঐ ধরনের কোন ব্যবস্থার অস্তিত্ব নেই। আমাদের এখন নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে এমন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যা দিয়ে সকলের জন্যেই ক্ষতিকর সামরিক প্রতিযোগিতা প্রতিরোধ করা যায়?

সাধারণ মানুষ তো বটেই, এমনকি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অনেকেই পারমাণবিক যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে এ বিষয়ে অজ্ঞ। সাধারণ লোকেরা এখনো শুধু একটা কথাই বোঝে, কিভাবে শহরগুলো যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হতে পারে। ইতিমধ্যে এ বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে, নতুন আবিষ্কৃত বোমা পুরনো-গুলোর চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাশালী। একটা আণবিক বোমা হিরোশিমা ধ্বংসের জন্যে যথেষ্ট ছিল। তেমনি একটি মাত্র উদযান বোমা নিউইয়র্ক, লণ্ডন ও মস্কোর মতো বৃহত্তম নগরীগুলো সহজে ধ্বংস করে দিতে পারে।

কোন সন্দেহ নেই, উদযান বোমার যুদ্ধে বৃহত্তম নগরীগুলো অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এটা হচ্ছে একান্তই সহজ কথা। লণ্ডন, নিউইয়র্ক কিংবা মস্কোর সবাই যদি সে যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে হয়তো কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই পৃথিবী আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু বিকীনিতে আণবিক বিস্ফোরণের পরে আমরা জানতে পেরেছি যে, পারমাণবিক বোমা ক্রমাণ্বয়ে সারা বিশ্বে এর ধ্বংসলীলা ছড়িয়ে দিতে পারে। এমনকি আগের ধারণার চেয়েও তা বেশী।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে যে, হিরোশিমা ধ্বংসের জন্যে যে বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল এর চেয়েও আড়াই হাজার গুণ বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন বোমা তৈরী করা সম্ভবপর। এ ধরনের বোমা জলে কিংবা স্থলে বিস্ফোরিত হলে উপরের বায়ুস্তরে তেজস্ক্রিয় কণা ছড়িয়ে দেয়। পরে ধীরে ধীরে আবার ঐসব মারাত্মক কণা ধূলি কিংবা বৃষ্টির সাথে মিশে পৃথিবীতে ফিরে আসে। এ ধরনের ধূলিকণাই জাপানী মৎস্য শিকারীদেরকে সংক্রমিত করেছিল।

কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় কী পরিমাণে মৃত্যুঘাতী ঐসব ধূলিকণা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে উদযান মহাসমর মানব জাতির অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে পারে। আশংকা করা হয় যে, উদযান বোমার যথেষ্ট ব্যবহার সারা বিশ্বের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে। হতে পারে, সহসা মৃত্যুর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু রোগ ও বিচ্ছিন্নতার যাত-নায় আর সব মানুষ তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবে। বিজ্ঞানী ও

BanglaBook.org

সামরিক বিশেষজ্ঞরা এ যাবৎ পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বহু সতর্ক বাণী উচ্চারণ করেছেন। মারাত্মক প্রতিক্রিয়া যে ঘটবেই এ সম্বন্ধে কেউ কিছু নিশ্চিত করে বলতে পারবে না। ওরা যা বলছেন তা হোল সম্ভাবনা সম্পর্কে। আর এমন যে ঘটতে পারে না এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবে না। এ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, বিশেষ কোন সংস্কারবোধ কিংবা রাজনীতির দরুন ওরা এসব কথা বলছেন। ওরা যা বলছেন তা বিশেষতঃ বিশেষজ্ঞদের গবেষণার উপরে নির্ভর করেই। আমরা দেখেছি যাঁরা এ বিষয়ে যতবেশী জানেন তত বেশী পরিমাণে বিষন্ন হয়েছেন।

এক্ষণে এমন একটা সমস্যার কথা বলছি যা থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই যা ভয়াবহ, যা নিদারুণ—আমরা কি মানব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো, না মানব জাতিই যুদ্ধকে বর্জন করবে? (এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক জুলিও কুরি যোগ করতে চেয়েছেন—'বিভিন্ন রাষ্ট্রের মতানৈক্য নিরসনের পন্থা হিসাবে' —কথাটুকু)। বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ জনসাধারণের হাতে নেই, কেননা যুদ্ধ রহিত করা অত্যন্ত কষ্টকর।

যুদ্ধ বন্ধ করা প্রশ্নটি জাতীয় সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা চিহ্নিতকরণের দাবীর সাথে অবিচ্ছিন্ন এবং সে কারণে অনেকেরই তা পছন্দ না হতে পারে। (অধ্যাপক জুলিও কুরির সংযোজন হোল: 'সকলকেই নিজেদের স্বার্থে তা মেনে নিতে হবে।') কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবনে প্রধান অন্তরায় হোল—'মানব জাতি' শব্দটার অর্থ সম্বন্ধে অস্পষ্টতা ও সংকীর্ণ ধারণা নিয়ে। মানুষ কদাচিৎ এ কথাটা বুঝে যে, অস্পষ্টভাবে অনুমিত বিপদ শুধু মানবতারই নয়—তা হচ্ছে ওদের নিজের, ওদের শিশুদের, ওদের প্রপৌত্রদের জন্যেও। এ কথাটা এরা বুঝে না যে ব্যক্তিবিশেষ হিসাবে ওরা সবাই আসন্ন বিপদে মর্মান্তিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার অবস্থার সম্মুখীন। অতএব, ওরা মনে করে যে, আধুনিক অস্ত্রসজ্জা নিষিদ্ধ হলে সম্ভবতঃ যুদ্ধের সম্ভাবনা বিদূরিত হবে না।

এ ধরনের আশা পোষণ করা নিতান্তই ভুল। উদযান বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ করে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় যত চুক্তি সম্পন্নই হোক না কেন, যুদ্ধকালীন সময়ে এর কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে উভয় পক্ষই উদ্‌যান বোমা তৈরীর ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়ে পড়বে। আর

BanglaBook.org

যে পক্ষ এ ব্যাপারে যত বেশী এগিয়ে যেতে পারবে সে পক্ষেরই বিজয় সম্ভাবনা তত বেশী।

এটা মিথ্যে নয় হয়তো, যে সমরসজ্জার সাধারণ হ্রাস চূড়ান্ত সমাধানের পথে যথেষ্ট নয় তবু কিছু পরিমাণ প্রয়োজনীয় লক্ষ্য অর্জনে নিশ্চয়ই সহায়ক।

('সমরসজ্জার সাধারণ হ্রাস' কথাটা অধ্যাপক ম্যুলার বুঝাতে চান এ অর্থে—অস্ত্র প্রতিযোগিতায় একটা সংযুক্ত ও সুষম হ্রাস।')

প্রথমতঃ, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে উত্তেজনার হ্রাসের নিমিত্ত চুক্তি সম্পাদন প্রচেষ্টা,

দ্বিতীয়তঃ, পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা রহিত করা, যদি উভয় পক্ষই পরস্পরের উপরে আস্থা রেখে তা করে, তাহলে পালিহারবার ধরনের আকস্মিক আক্রমণের যে ভয় এখন উভয় পক্ষকেই শংকিত করে রেখেছে তা সহজেই হ্রাস করা যাবে।

সুতরাং, আমরা এ ধরনের যে কোন চুক্তিকেই সাদরে গ্রহণ করবো—যদিও তা শুধু প্রাথমিক স্তর হিসাবে।

আমাদের অনেকেরই চিন্তাধারা পক্ষপাতহীন নয়। তবু মানুষ হিসাবে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে কোন সমস্যাই যুদ্ধের মাধ্যমে অবশ্যই মীমাংসিত হবে না এবং তা বিশেষ কোন পক্ষের মন রক্ষা করে নয়। কম্যুনিস্ট, অকম্যুনিস্ট, এশিয়ান, ইউরোপীয়ান কিংবা আমেরিকান, সাদা কিংবা কালো—যে-ই হোক সবার ক্ষেত্রে নির্বিশেষে তা প্রযোজ্য। বাধাহীনভাবে শান্তি অর্জন, জ্ঞান ও শিক্ষার সাধনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভবপর—যদি আমরা আন্তরিকতার সাথে তা করতে চাই। এর পরিবর্তে কি আমাদের মৃত্যুকেই বেছে নেওয়া উচিত—আমরা বিরোধের পথ ভুলে যেতে পারি না বলে? মানুষ হিসাবে মানুষের কাছে আমাদের আবেদন: আপনাদের মনুষ্যত্বের কথা স্মরণ করুন। আর ভুলে যান অন্য সব কথা। যদি আপনারা তা পারেন—স্বর্গের পথ উন্মুক্ত রয়েছে আপনাদের জন্যে; আর যদি তা না পারেন একটা সার্বিক ধ্বংসের ঝুঁকি রয়েছে আপনাদের সামনে।

বিজ্ঞানীদের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল

BanglaBook.org

যেন এঁরা যতটা সম্ভব ভোটের মাধ্যমে নিম্নে বর্ণিত প্রস্তাবটি বিবেচনা করেন:

প্রস্তাব

আমরা এ মহাসভাকে অবহিত করছি আর এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন যেন নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি সমর্থিত হয়, যেহেতু এটা সত্য, যে কোন মহাসমরে অবশ্যই পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার হবে এবং যেহেতু ঐ সমস্ত অস্ত্র মনুষ্য জাতির অস্তিত্বকে বিপন্ন করবে, সেহেতু আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সরকারের কাছে আবেদন করছি, সবাই যেন এ বিষয়টা অনুধাবন করে সর্বসাধারণ্যে তা প্রকাশ করেন, যে মহাসমরের মাধ্যমে তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয় এবং সে কারণে আমাদের আবেদন, যেন সকল বিষয়ে নিজেদের বিরোধ নিষ্পত্তি শান্তিপূর্ণ পন্থায় স্থিরিকৃত করা হয়।

পরবর্তীকালের 'পাগওয়াশ' সম্মেলনেও এর প্রতিধ্বনি করা হয়।

সমস্ত দলিলের আবেদনে যাঁরা স্বাক্ষর দান করেছিলেন এরা হলেন:

অধ্যাপক ম্যাক্সবর্ন (জার্মানী)—পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ।

অধ্যাপক পি. ডব্লিউ. ব্রিজম্যান (হার্বার্ড)—পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ।

অধ্যাপক আলবার্ট আইনস্টাইন।

অধ্যাপক এল. ইনফেল্ড্ (পোল্যাণ্ড)—পোলিশ একাডেমী অব সাইন্স-এর সদস্য ও 'দি রিভুল্যুশন অব ফিজিক্স' ও 'দি প্রব্লেম অব্ মোশন' গ্রন্থসমূহে আইনস্টাইন-এর সহকর্মী।

অধ্যাপক এইচ. জে. ম্যুলার (যুক্তরাষ্ট্র)—শরীরবিদ্যা ও মেডিসিন-এ নোবেল প্রাইজ।

অধ্যাপক সি. এফ. পাওয়েল—(যুক্তরাজ্য) পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ।

অধ্যাপক জে. রটব্ল্যাট—(যুক্তরাজ্য) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক।

বার্ট্রেণ্ড রাসেল

অধ্যাপক হিদেকী ইউকায়া (জাপান)—পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজ।

BanglaBook.org

আলোচ্য বিবৃতিটা নিম্নলিখিত পত্রের সাথে বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে পাঠিয়েছিলাম:

"প্রিয়- - - - -

অত্র পত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট বিবৃতিখানি পারমাণবিক যুদ্ধের ব্যাপারে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা স্বাক্ষরিত। এর মধ্যে রয়েছে এ ধরনের যুদ্ধের ফলে যে মর্মান্তিক ও অপূরণীয় ধ্বংসলীলা হতে পারে সে বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা। তাছাড়া রয়েছে যুদ্ধকে বাদ দিয়ে কিভাবে আন্তর্জাতিক বিরোধগুলোর সুরাহা সম্ভবপর। আমার একান্ত অনুরোধ, এ আলোচ্য সমস্যার ব্যাপারে আপনার মতামত জনসমক্ষে প্রকাশ করে জানিয়ে দেবেন। কেননা মানব জাতি এর আগে কখনো এমন ধরনের সাংঘাতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়নি।

—আপনার বিশ্বস্ত

(স্বাক্ষরিত) বার্ট্রেণ্ড রাসেল।

এ বিবৃতিটা প্রকাশ করার সময়ে এগারো জন স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে দু'জন কিছুটা সংযত ছিলেন। বিবৃতির মাধ্যমে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের ও নিরপেক্ষ জাতিসমূহকে নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য আহ্বান করা হয়। এর জন্যে যে অভাব ছিল তা হচ্ছে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থের। কেননা কিছুসংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন যাদের পক্ষে নিজেদের রাহাখরচ যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত কোন সংস্থা থেকে কোন চাঁদা গ্রহণ করা হবে না, কিন্তু সাইরাস ইয়াটন-এর বদান্যতা ঐ সমস্যাকে সমাধান করে দিয়েছিল। পাগওয়াসে তাঁর নিজের সম্পত্তি সম্মেলনের জন্যে অর্পণ করে দিয়েছিলেন। এর ফলে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তহবিল সংগঠনে সম্মেলনের কোন বেগ পেতে হয়নি। পরিণামে দেখা গেল যখন বহু দেশের বিজ্ঞানীরা নিজস্ব রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে নিজেদের মতামত আদান-প্রদান করেন তখন সরকারী পর্যায়ে আলোচিত বিভিন্ন চুক্তির চেয়ে তা ছিল অধিকতর ফলপ্রসূ। এ ধরনের সম্মেলন যাতে ভবিষ্যতে আরো চলতে থাকে এজন্যে কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। প্রস্তাব নেয়া হোল যেন ভবিষ্যতের বিশেষ কোন বিষয় নিয়ে ছোট

BanglaBook.org

ছোট সম্মেলন আহূত হওয়া ছাড়াও, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আকারের সম্মেলনের ব্যবস্থা করা হবে যাতে বিজ্ঞানীরাই শুধু থাকবেন না—যাদের মূল্যবান বক্তব্য রয়েছে এমন ধরনের সমাজতত্ত্ব-বিদ ও অর্থনীতিবিদদেরও এর মধ্যে স্থান দেওয়া হবে। এ পর্যন্ত এ ধরনের ছয়টি সম্মেলন হয়েছে এবং এমন সব রিপোর্ট তৈরী সম্ভব হয়েছিল যার মধ্যে কম্যুনিস্ট জোট, পাশ্চাত্য ও নিরপেক্ষ জোটগুলোর প্রতিনিধিরা একমত ছিলেন। ১৯৫৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর ভিয়েনা ডিক্লারেশন-এর তৃতীয় পাগওয়াসা সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণাপত্র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অবশ্য একজন আমেরিকান প্রতিনিধি এর মধ্যে অংশ-গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। ঘোষণাপত্রের আংশিক উদ্ধৃতি হোল নিম্নরূপ:

"যে মুহূর্তে দেখা গেল যে পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নয়ন সুস্পষ্টভাবে সভ্যতা ও সাথে সাথে নিজেদের বিনাশ সম্ভবপর করে তুলেছে তখন আমরা কিজবুহেল ও ভিয়েনার সম্মেলনে একত্রিত হই। আমাদের ধারণা যে ধ্বংসকামী অস্ত্রসজ্জা আগের চেয়েও যোগ্যতার সাথে গড়ে উঠেছে। আমাদের আহূত সভাসমূহে যে সব বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন এঁরা সবাই পূর্ব থেকেই এর ফলে শংকিত। এ বিষয়ে এঁরা সম্পূর্ণ একমত যে, পূর্ণ পারমাণবিক যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী ধ্বংসলীলা সংঘটিত করবে—ব্যাপকতার দিক থেকে যার নজির আর নেই।

আমার সুচিন্তিত অভিমত হোল, পারমাণবিক আক্রমণ প্রতিহত করা খুবই কষ্টসাধ্য। প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে ভিত্তিহীন আত্মপ্রসাদ যুদ্ধকেই অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে পারে।

হয়ত বিভিন্ন জাতিসমূহ পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে একমত হতে পারে এবং সাথে সাথে মানুষ-বিধ্বংসী অন্যান্য অস্ত্রসমূহকেও বর্জন করতে পারে; কিন্তু ঐ ধরনের মারণাস্ত্র তৈরীর বিদ্যেটা তো আর ধ্বংস করা যাবে না। অনাদিকালের জন্যে মানবজাতির প্রতি ভীতি প্রদর্শনের প্রচ্ছন্ন শক্তি হিসাবে অস্ত্রগুলো থেকেই যাবে। ভবিষ্যতে যদি কোন ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে আক্রান্ত রাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে শুধু প্রয়োজনই বোধ করবে না, সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও বাধ্য হবে। কেননা, যুদ্ধাবস্থায় এমন ধরনের ব্যবস্থা যে শত্রু

BanglaBook.org

গ্রহণ করবে না এ বিষয়ে কোন রাষ্ট্রই নিশ্চিত হতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস শিল্পে উন্নত শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে এক বছরের চেয়ে কম সময়ে আণবিক অস্ত্র একত্রিত করার জন্যে কাজ আরম্ভ করা সম্ভবপর। তারপর থেকে ঐ ধরনের অস্ত্র ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্যে প্রয়োজন হবে ঐ সব চুক্তিসমূহের যা সম্পাদিত হয়েছিল শান্তিকালীন সময়ে। অবিসংবাদি পারমাণবিক অস্ত্র ক্ষমতাকে ব্যবহারের লোভ থেকে নিবৃত্ত করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এবং তা বিশেষভাবে সত্য ওদের জন্যে যারা পরাজয়ের সম্মুখীন। সুতরাং আমাদের মনে হচ্ছে যে, ভবিষ্যতের যে কোন বড় রকমের যুদ্ধে এর ভয়াবহ পরিণতি জেনেও তা ব্যবহার করার সম্ভাবনা পুরোপুরিভাবে রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে, আঞ্চলিক যুদ্ধ সীমিত উদ্দেশ্য সংঘটিত হলে তেমন কোন প্রকার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না। ইতিহাসে প্রমাণ রয়েছে যে, আঞ্চলিক যুদ্ধের সর্বাত্মক সংঘাতে রূপান্তরিত হওয়ার ঝুঁকি অন্ততঃ এ যুগের মারাত্মক ধ্বংসের অস্ত্রসজ্জায় মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মানব জাতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক যুদ্ধসহ বড় বড় রকমের যুদ্ধকে বর্জন করার জন্যে অবশ্যই কাজ করে যেতে হবে।

অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফল। তাছাড়া এর ফলে অবিশ্বাস ও সন্দেহকেই শুধু বাড়িয়ে তোলা হয়। সুতরাং সমপরিমাণের ভিত্তিতে ও প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শর্তে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিদূরিত করার প্রচেষ্টা, এমনকি সামান্য পরিমাণ অস্ত্রসজ্জা ও সামরিক শক্তি হ্রাস হলেও, একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষিত এ বিষয়ে যাবতীয় ব্যবস্থা, বিশেষ করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিদের পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণের গোপনীয়তা আবিষ্কারের জন্যে জেনেভা চুক্তির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা আমরা সাদরে অভিনন্দিত করবো। এ বিষয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা বহুবার ব্যর্থ হয়ে যাবার পরে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এ ব্যাপারে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার প্রচেষ্টাকে সম্ভব করেছিল। আমরা প্রীত হয়েছি এটা লক্ষ্য করে যে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া কারিগরি বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব সম্বলিত বিবৃতি অনুমোদন করেছিলেন। এটা নিঃসন্দেহে একটা গুরুত্বপূর্ণ সফলতা। আমরা

BanglaBook.org

আশা করি যে, এ ধরনের স্বীকৃতি পারমাণবিক পরীক্ষারোধ ও কার্যকরী পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে শীঘ্রই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা হ্রাস করার ব্যাপারে এটাই হবে প্রাথমিক ব্যবস্থা।

সম্মেলনে বিভিন্ন রিপোর্ট ও দলিলের মাধ্যমে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। ঐ সমস্ত দলিল এটাই প্রমাণ করে যে, ভবিষ্যতের কোন যুদ্ধে আজ পর্যন্ত যে পরিমাণে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী হয়েছে এর বিশেষ অংশই বিভিন্ন লক্ষ্যস্থলে ব্যবহৃত হবে। ফলে, আক্রান্ত দেশসমূহের সভ্যতার কেন্দ্রস্থলগুলো সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং জনসংখ্যার বিরাট অংশই এর ফলে মৃত্যুবরণ করবে। আণবিক কিংবা উদ্‌যান যেটাই এর মূলে থাকুক না কেন—এমন ধরনের ঘটনা ঘটতে যে বাধ্য এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। গণ-অধ্যুষিত কিংবা শিল্পাঞ্চল কেন্দ্রগুলো ছাড়াও আক্রান্ত দেশের অর্থনীতি বণ্টন ও যোগাযাগ ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।

বৃহৎ ক্ষমতাসম্পন্ন দেশগুলোর হাতে আগে থেকেই পারমাণবিক অস্ত্র মজুদ রয়েছে। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে আণবিক বোমার বিভিন্ন অবস্থায় কতকগুলো ভালো সুবিধাও রয়েছে এবং এর জন্যে ব্যাপক লড়াইয়ে এর ব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আণবিক বোমার ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সঞ্চিত তেজস্ক্রিয় ভস্ম সীমিত অঞ্চলের আক্রান্ত জনগণের বিরাট অংশের মৃত্যুর কারণ হবে। ঐ সব বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় ভস্ম তখন আর নির্দিষ্ট লক্ষ্য-বস্তুর শুধু ক্ষতি করবে না, পৃথিবীর সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়বে। প্রতিটি বিস্ফোরণ লক্ষ লক্ষ টন সাধারণ রাসায়নিক বিস্ফোরক দ্রব্যের সমতুল্য ক্ষমতার অধিকারী। সাংঘাতিক তেজস্ক্রিয়া বিচ্ছুরণের ফলে আক্রান্ত ও অনাক্রান্ত দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটবে।

তাছাড়া রয়েছে প্রভূত পরিমাণে বহু দিন যাবৎ তেজস্ক্রিয়া বিচ্ছুরণের ফলে ক্ষতির সম্ভাবনা। এগুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবকোষের ক্ষতি, ব্লাড-ক্যান্সার, হাড়-ক্যান্সার, জীবনীশক্তির হ্রাস। তাছাড়া রয়েছে বংশ পরম্পরার মধ্যে বিরাজিত স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষমতার ক্ষতি।

BanglaBook.org

বলবাহুল্য, পারমাণবিক যুদ্ধের দরুন মানুষের যে আঙ্গিক ক্ষতি হবে তা পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী। মানব জাতির জন্যে এক্ষুণি যা প্রয়োজন তা হলো যুদ্ধ বন্ধ করার জন্যে শর্ত প্রতিষ্ঠিত করা।

বিজ্ঞানী হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি, বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতার নিশ্চয়তা বিধানে আমাদের কর্তব্য একান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সনাতন বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী বিজ্ঞান সাধনা আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধের উপরে পর্যবসিত। জাতিগত প্রভেদ সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা একে অপরের সাথে সমঝোতার জন্যে প্রয়োজনীয় ভিত্তি সহজেই তৈরী করতে পারেন। এঁদের গৃহীত পদ্ধতি ও মতবাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন বিরোধ নেই। দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভেদ সত্ত্বেও সাধনার লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যে এঁরা সবাই কাজ করে যায়। দ্রুত উন্নয়নশীল বিজ্ঞানের গুরুত্ব পারস্পরিক সমঝোতা-সম্পন্ন সম্প্রদায়ের গতিকেও উৎসাহিত করে।

সাধারণ লক্ষ্য অর্জন ও ক্ষমতার সূত্রে আবদ্ধ করে নানা জাতির মানুষের ব্যবধান দূরীভূত করার ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের ক্ষমতা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতা সম্ভবপর সেখানে পাশাপাশি কাজ করে যেতে পারলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দরদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করা যায়। নিশ্চিতভাবেই এ ধরনের অবস্থা পারস্পরিক আস্থা অর্জনের পথকে সুগম করে দেয়। কেননা, রাজনৈতিক সংঘাত সমাধান ও নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার পটভূমি এর ফলেই গড়ে উঠে।

আমরা আশা করি সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা মানব জাতি ও নিজেদের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব রয়েছে এর গুরুত্ব মেনে নেবেন। আমরা আরো আশা করি, এঁরা নিজেদের সাধনা, সময় ও কর্মস্পৃহাকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণে নিয়োজিত করবেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে, মানব জাতির সেবার জন্যে বিজ্ঞানের মূল্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর, এজন্যে যে কোন গোঁড়ামির হস্তক্ষেপ থেকে তাকে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। অবশ্য প্রচলিত মতবাদ কিংবা প্রয়োজন ক্ষেত্রে নিজেদের বিশ্বাসকেও এক্ষেত্রে প্রশ্ন করা বুঝায়।

BanglaBook.org

পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সামরিক আধিপত্য অর্জনের প্রতিযোগিতা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও মনস্তত্ত্বকেও সামরিক শক্তি উন্নয়ন জড়িত করে ফেলেছে। বহু দেশের মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিজ্ঞান অস্ত্র ক্ষমতা উন্নয়নের কাজে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেছে। বিজ্ঞানীদেরকে এখন শুধু দু'টো দৃষ্টিতেই বিচার করা হয়—প্রথমতঃ জাতীয় নিরাপত্তা বিধানে অংশ গ্রহণের জন্যে প্রশংসা অথবা মানুষ মারার অস্ত্র তৈরীর জন্যে ঘৃণা। অনেক দেশে এখন যে বিজ্ঞানীদেরকে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে এর মূলে রয়েছে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ সামরিক শক্তি কিংবা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বিধানের জন্যেই। ফলে যা হবার তা হোল। প্রকৃত সাধনার উদ্দেশ্য থেকে বিজ্ঞান বিভ্রান্ত হোল। বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য হোল মানুষের জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধি ও সকলের মঙ্গলের জন্যে প্রকৃতির উপরে প্রভুত্ব করার ব্যাপারে মানুষকে সাহায্য করা।

এ ধরনের পরিস্থিতি আমাদের কাম্য নয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও তাদের সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, যেন স্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এ ঘোষণায় স্বাক্ষর দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, ডেনমার্ক, পূর্ব জার্মান, হাঙ্গেরী, নেদারল্যাণ্ডস্ ও নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া থেকে আগত প্রতিটি দেশের একজন করে বৈজ্ঞানিক। তাছাড়া কানাডা (২), চেকোশ্লোভিয়া (২), ইটালী (২), ভারত (৩), ফ্রান্স (৪), পশ্চিম জার্মানী (৫), যুক্তরাজ্য (৭), রাশিয়া (১০), জাপান (৫) ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত ২০ জন প্রতিনিধিদল। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কিত সিনেট কমিটি 'পাগওয়াশ' আন্দোলনের প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। এই কমিটির রিপোর্ট সত্যিই অপ্রত্যাশিত ও আশ্চর্যজনক। এ রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমন করার ব্যাপারে যারাই চেষ্টা করুন না কেন এর পেছনে রয়েছে কম্যুনিস্টদের প্ররোচনা। রিপোর্টে আরো বলা হয়, কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্টদের কম-বেশী কিছুটা বন্ধুত্বের মধ্যে আলোচনা হলে অকম্যুনিস্ট ব্যক্তির যত ক্ষমতাই থাকুক না কেন কম্যুনিস্ট মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি নিঃসন্দেহে তাকে বুদ্ধির দিক থেকে বেকায়দায় ফেলতে পারবে। তাছাড়া রিপোর্টে আরো বলা হয়

BanglaBook.org

যে, কম্যুনিস্ট ব্যক্তিরাই পাগওয়াশ শান্তি আলোচনার প্রস্তাবসমূহ স্বাক্ষর করেছে এবং এসত্ত্বেও রাশিয়া যুদ্ধের জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছে।

রিপোর্ট-এ স্বেচ্ছাকৃতভাবে এমন একটা অপকৌশল দেখানো হয়েছিল যা সত্যিই বিস্ময়কর। আমার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে আমার একটা বিবৃতি থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু শেষ ছত্রে যেখানে আমি নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছিলাম তা বাদ দেওয়া হয়ঃ "আমরা যে পক্ষ সমর্থন করি তাদের বিজয়ের জন্যে কোন্ ধরনের ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় সে বিষয়ে চিন্তা করার মত মনের সংকীর্ণতা যেন আমাদের না আসে; কেননা ঐ ধরনের কোন প্রকার ব্যবস্থার অস্তিত্ব আর আছে বলে আমি মনে করি না।"

আলোচ্য রিপোর্ট-এ এটাও বলা হয় যে, ১৯৪৮ সনে আমার প্রদত্ত অভিমত ১৯৫৯ সনে এসে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে এবং দরদের সাথেই বলে যে, ১৯৪৮ সনে রাসেল-এর বয়স ছিল মাত্র ৭৬ বছর—আর পক্ষান্তরে ১৯৫৯ সনে তিনি ৮৭ বছরের বৃদ্ধ লোক।

একটা বিষয় রিপোর্ট-এ বাদ পড়ে গিয়েছিল যে, গত কয়েক বছরে আরো বার্ধক্যের দিকে আমি নেমে গিয়েছি এবং তা হোল প্রথম দিকে শুধু আমেরিকার হাতেই আণবিক বোমা ছিল, আর পরবর্তীকালে, রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েরই হাতে উদযান বোমা। পাগওয়াশ সম্মেলনে কম্যুনিস্ট ব্যক্তিরা ছিলেন এ কথাটায় মনে হয় যে এটাই হচ্ছে সম্মেলনকে নিন্দা করার একমাত্র কারণ। কম্যুনিস্টদের অনুপস্থিতিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের উত্তেজনা হ্রাসের প্রচেষ্টা কার্যকরীভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় আর এর মধ্যেই ছিল তিরস্কারের কারণ।

পলিং-এর লিখিত 'আর যুদ্ধ নয়' বইখানি (No More War) রাশিয়ার স্বীকৃতি অর্জনে সক্ষম হয় আর স্পষ্টত এটাই ছিল পলিং-এর অপরাধ; কেননা রিপোর্টটির মতে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষ পারমাণবিক যুদ্ধের বিরোধিতা করতে পারে না।

সে যাহোক ওগুলো ছিল ছোটখাটো সমালোচনা। রিপোর্টের মতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা একান্তই সহজ সরল মানুষ। "যাঁরা নির্দোষভাবেই বিশ্বাস করেন যে, রাশিয়ার সম্মেলনে যোগদানের পেছনে জ্ঞান

BanglaBook.org

অর্জনের উদ্দেশ্যটাই ছিল মুখ্য এবং যার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা যায় অথবা আদর্শমূলক শান্তি আন্দোলনকে জোরদার করা সম্ভব হয়। পাগওয়াশ বৈজ্ঞানিকদের গুহ্য উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্যে 'সিনেট ইণ্টারনাল সিকিউরিটি কমিটি' বিষয়ের গভীরে বিশ্লেষণ চালায়।

'বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজে প্ররোচনা দান' শিরোনামায় আলোচ্য রিপোর্টে একটা অংশ ছিল। এর মধ্যে এলান নান মে, জুলিয়াস রোজেনবার্গ ও ক্লাউস ফুকস্-এর কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিবরণ ছিল। উদ্দেশ্য ছিল পাঠক মনে এ ধারণার সৃষ্টি করা যে ঐ সমস্ত 'বিশ্বাসঘাতকেরা' যেমন করেই হোক পাগওয়াশ আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এর চেয়ে অসৎ ও দূরভিসন্ধিমূলক প্রচার অভিযান আমি কখনো দেখিনি।

রিপোর্ট-এর আদি-অন্তে শুধু এ কথাটাই বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, নীতিহীন রাশিয়ানরা শান্তির স্বপক্ষে এবং দেশপ্রেমিক আমেরিকানগণ যুদ্ধের প্রশংসায় মুখর। যে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই এ রিপোর্ট পড়ার পরে এবং বিশ্বাস করে স্বাভাবিকভাবেই রাশিয়াকে সমর্থন করতে বাধ্য হোত। সৌভাগ্যের কথা, এ রিপোর্টে প্রতিবিম্বিত পাশ্চাত্য প্রকৃতপক্ষে ততটা জঘন্য নয়। কিন্তু সিনেট কমিটির নির্যাতন করার অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় উপেক্ষা করা খুবই বিজ্ঞোচিত হবে না এবং এ ক্ষমতা প্রধানতঃ সুস্থ চেতনাকে বিভ্রান্ত ও নিরাশ করার ব্যাপারে খাটানো হয়ে থাকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানুষের অস্তিত্বের স্বপক্ষে দীর্ঘকালীন শর্তাবলী

বর্তমান অধ্যায়ে পাঠকের প্রতি আমার অনুরোধ তারা যেন মুহূর্তের জন্যে হলেও সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনাবলী ও অদূর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সম্ভাবনাসমূহ ভুলে যান। আরো অনুরোধ করবো যেন ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা পছন্দ-অপছন্দ এবং নীতিগত বিশ্বাসকে ভুলে যান। বর্তমান অধ্যায়ে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এমন সব শর্তের আলোচনা করতে চাই যেগুলো দীর্ঘ-দিনের জন্যে অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। দৈহিক অবস্থা সম্বন্ধে বলতে গেলে একথা বলা যেতে পারে, এমন কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি থাকতে পারে না যে কারণে জীবনধারণ (মানুষের জীবন সহ) লক্ষ লক্ষ বছর ধরে চলতে পারে না। বিপদ যা আসে তা মানুষের দৈহিক অথবা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আসে না। এর মূলে রয়েছে মানুষ নিজেই। এ পর্যন্ত মানুষ বেঁচে আছে অজ্ঞতার মাধ্যমে। এখন কি আর সে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অজ্ঞতা হারিয়ে গিয়েছে বলে বেঁচে থাকতে পারবে?

এক ধরনের কিছুটা স্বল্পকালীন অস্তিত্ব জিইয়ে রাখা হয়ত অসম্ভব হবে না। এমন হতে পারে যে, অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হলেও কেউ কেউ বেঁচে থাকবেন; কিন্তু সভ্যতার কোন নিদর্শন আর তখন বেঁচে থাকবে না। যারা বেঁচে থাকবে তাদের প্রায় সমস্ত সময়ে নিয়োজিত থাকতে হবে খাদ্যদ্রব্যের খোঁজে। সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠান এ ধ্বংস থেকে রেহাই পাবে না। ফলে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। এহেন পরিস্থিতিতে

BanglaBook.org

মানব জাতি গত কয়েক হাজার বছরের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করবে এবং সে অবস্থায় আমাদের মত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে আবার ঠিক আমাদের সমতুল্য ভুলে নিজেদের ধ্বংসের পথকে ত্বরান্বিত করবে। এটা হোল মানব জাতির বেঁচে থাকার একটা দিক, কিন্তু এমন কিছু একটা হবে না যা সুখ-শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারবে। অনুমান করছি যে, মানুষ বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশলে সক্ষম থাকতে পারে, কিন্তু এমন কোন পথের সম্ভাবনা আছে কি যা দিয়ে সর্বাত্মক ধ্বংস থেকে রেহাই পেতে পারে? আমরা আজ একটা প্রশ্ন করছি—যা "মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে কি?"-এ প্রশ্নটার চেয়ে সঙ্কীর্ণতর। আমাদের আজ জিজ্ঞাস্য—"বৈজ্ঞানিক সমাজের মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে কি?" মানুষ পরবর্তী দশ কিংবা একশো বছর বেঁচে থাকতে পারবে কিনা—এটাই শুধু আমার জিজ্ঞাস্য নয়। বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে কিংবা সৌভাগ্যবশতঃ হয়ত বিরাট বিপদ থেকে মানুষ রেহাই পেতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্য কখনও চিরস্থায়ী নয় এবং বিপদের সম্ভাবনাকে বাড়তে দিলে, আগে কিংবা পরে প্রতিহিংসা নেমে আসবেই।

এ সমস্ত কারণে, বাস্তবতার দিক থেকে আমার ভয় হয় যে, নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক সমাজের মানুষ বেশী দিন বাঁচতে পারে না যদি বর্তমানে আন্তর্জাতিক অরাজকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যতদিন পর্যন্ত সামরিক ক্ষমতার কর্তৃত্ব বিশেষ কোন জাতিসমূহের অথবা বিভিন্ন জাতীয় গোষ্ঠীর থাকবে এবং যাদের অবিসংবাদি একচ্ছত্র ক্ষমতা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি যতক্ষণ না থাকবে, এটা প্রায় নিঃসন্দেহ যে আজ কিংবা কাল হোক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং যতক্ষণ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের উন্নয়ন চলতে থাকবে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ক্রমাণ্বয়েই মারাত্মক হবে। খরচের দিক থেকে উদ্যান বোমার তুলনায় নগণ্য হবে এমন ধরনের অস্ত্রের সম্ভাবনা আগে থেকেই রয়েছে। প্রলয়ংকরী যন্ত্র (Dooms day machine) আমাদের সবাইকে বিলুপ্ত করে দিতে পারে এবং এ ধরনের অস্ত্র এখন সহজেই নির্মাণ করা সম্ভবপর। আমাদের জানা উচিত, হয়ত আগেই তা তৈরী হয়ে আছে। তুলনায় নগণ্যতম খরচ হবে যার মধ্যে তার নাম 'কোবাল্ট বোমা'। এটা প্রায় উদ্‌যান বোমার মতই, তবে প্রভেদটা এই যে, কোবাল্ট বোমার

BanglaBook.org

বহির্দেশে রয়েছে কোবাল্ট আর উদ্‌যানের রয়েছে ইউরেনিয়াম। এর বিস্ফোরণের ফলে কোবাল্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের উদ্ভব হবে যা ক্ষয় হবে ধীরে ধীরে। যদি যথেষ্ট পরিমাণ কোবাল্ট বোমার বিস্ফোরণ হয় তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যা মুছে যাবে। ১৯৬১ সনের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায় 'দি হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় লাইনাস্ পলিং একটা প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি অস্ত্রসজ্জায় যা প্রতি-বছর খরচ করে এর মাত্র বিশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ৬ বিলিয়ন ডলারে প্রচুর কোবাল্ট বোমা তৈরী করা যেতে পারে যা দিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মৃত্যুর নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হবে। যত রকমের রক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনাই করুক না কেন কোন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা একান্তভাবে অসম্ভব।

ধ্বংসের জন্যে কোবাল্ট বোমা শুধু একটি ব্যবস্থা মাত্র। বর্তমান দক্ষতা দিয়ে আরো অনেকগুলো তৈরী করা যেতে পারে এবং বর্তমান সরকারসমূহ যে এগুলোর কয়েকটা প্রয়োগ করবে না এমনটিও হতে পারে না।

এ সমস্ত কারণে, এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বৈজ্ঞা-নিক সমাজে মানুষের পক্ষে বেশী দিনটিকে থাকা সম্ভব হবে না। যদি না যুদ্ধের প্রধান প্রধান অস্ত্রসহ মানুষ ধ্বংস করার যাবতীয় উপ-করণ বিশেষ কোন একটা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন নিয়ে আসা হয় যার ফলে এবং একচেটিয়া অধিকারের ফলে, এর ক্ষমতা হবে অপ্রতিরোধ্য এবং যদি কেউ যুদ্ধ ঘোষণা করার মত দুঃসাহস করে তাহলে বিদ্রোহী-দের চূড়ান্ত আঘাত দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা যাবে—অথচ এতে অন্য কারো ক্ষতি সাধন হবে না। আর এটা নিঃসন্দেহে সহজ কথা যে শুধু এগুলোই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অধিকারী মানব সমাজের অস্তিত্বের জন্যে অপরিহার্য অঙ্গ।

এমন একটি পৃথিবীর স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্যে বহু ধরনের পথ রয়েছে। দু'পক্ষই উদযান বোমার অধিকারী না হলে শুধু একই পক্ষের হাতে ঐ মারণাস্ত্র থাকার ফলে পারমাণবিক যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার প্রতি-ক্রিয়াস্বরূপ অপর পক্ষকে নিজস্ব ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত করতে পারবে এবং এর মাধ্যমেই বাঞ্ছিত পৃথিবী গড়ে নেয়া সম্ভবপর হবে। কিন্তু

BanglaBook.org

এখন তা হবার নয়। ঠিক কি পরিমাণ ক্ষতি বর্তমান অস্ত্র নিয়ে পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে সাধিত হতে পারে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত কেউ কিছু বলতে পারবে না। আমরা কামনা করি এমন ধরনের অবস্থাই যেন চলতে থাকে। ন্যাটো (উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা) এবং ওয়ারস্ চুক্তিবদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে পারমাণবিক সংঘাত যদি ঘটে তাহলে অন্যান্য নিরপেক্ষ জাতিগুলো কিছু পরিমাণ সামাজিক ঐক্য বজায় রাখতে পারবে যার ফলে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভবপর হবে। ধরে নেয়া যাক্, যদি চীন বিজ্ঞতার সাথেই ঐ যুদ্ধে নিরপেক্ষতার ভূমিকায় থাকে এবং যদি যুদ্ধ চলাকালীন কয়েক দিন সময়ে প্রাচ্যের দিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করে তাহলে চীনের পক্ষে বিশ্বকে মুঠোয় নেয়া কষ্টকর হবে না। চীন যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে অথবা যদি পশ্চিমী বাতাস বইতে থাকে, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার মিত্রতায় বিশ্ব সাম্রাজ্য গড়ে উঠতে পারে। এ জাতীয় যাই কিছু ঘটুক না কেন, যে জাতি বেঁচে থাকবে তা বৃহৎ শক্তিগুলোর ধ্বংসের পরেও যা কিছু জনসংখ্যা থাকবে ওদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে এবং যুদ্ধের পরে বেঁচে থাকা জাতিসমূহের স্বেচ্ছাচারী শাসন ক্ষমতার শিকারে পরিণত হবে, কেননা তখন সে ক্ষমতাকে প্রতিহত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এটা হচ্ছে একটা পথ যে পথে অনুমান করা হচ্ছে, সরকারী পর্যায়ে পৃথিবী সংঘবদ্ধ হবে। এটা খুব আনন্দের ব্যাপার নয় এবং বর্তমানকালীন কোন পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিই হয়ত তা কামনা করবে না। যা হোক, আমি মনে করিনে যে, পারমাণবিক যুদ্ধের ফলে মোটেই তা ঘটতে পারবে। আমার মনে হয় এবং খুব সম্ভব তা-ই হবে, যুদ্ধে বিজড়িত কিংবা নিরপেক্ষ দেশে কোন সভ্যতার অস্তিত্ব থাকবে না।

বিশ্বশান্তি অর্জনের পক্ষে আকাঙ্খিত পথ হচ্ছে সকলের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কোন আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিজেদের সামরিক শক্তিকে একত্রিত করা। এখন হয়ত তা দুরূহ কাল্পনিক জগতের নামান্তর কিন্তু বাস্তববাদী রাজনীতিবিদরা তা মনে করেন না। মিঃ ম্যাকমিলান্ প্রতিরক্ষা সচিব থাকাকালীন সরকারী নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'হাউস অব কমন্স'-এ (মার্চ-১৯৫৫) বলেছিলেন—'নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্নে আমাদের লক্ষ্যের সহজ এবং পরিচ্ছন্ন রেকর্ড রয়েছে। সত্যকারের

BanglaBook.org

নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনা দু'টো সহজ অথচ সুষ্ঠু নীতির উপরে অবশ্যই পর্যবসিত হতে হবে। তাছাড়া এটাকে হতেই হবে পুরোপুরিভাবে ব্যাপক এবং এ অর্থে, আমি বুঝাতে চাই, সর্বরকমের অস্ত্র নতুন কিংবা পুরনো, প্রচলিত কিংবা অপ্রচলিত, নিরস্ত্রীকরণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। এর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব থাকবে প্রকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের হাতে। মাননীয় সদস্যরা হয়তো বলতে পারেন যে, এর ফলে জাতিসংঘের মর্যাদাকে বাড়িয়ে তোলা হবে অথবা নিয়ন্ত্রণের ভার যেখানেই থাকুক না কেন, এর ফলে বিশ্বসরকারের মত কিছু একটা সংস্থা গড়ে উঠবে। আমরা আশা করি, যেন তাই হয়। কেননা এর মধ্যে খারাপ কিছু নেই; ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে এ ছাড়া আর কোন পথও নেই।"

এ ধরনের মতামত ব্যক্ত করেছেন এমন সব আরো কয়েকজনের নাম আমি বলতে পারতাম যারা কল্পনাবিলাসী নন কিংবা রাজনৈতিক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও নন। কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে বিশ্বসরকার গঠনের বাস্তব কোন সম্ভাবনার সাথে আমি বিজড়িত নই। আমার কথা হচ্ছে সভ্য সমাজের অস্তিত্ব নিয়ে।

বিশ্বশান্তি অর্জন না করেও কিছু একটা ধরনের বিশ্বসরকার গঠন করা যেতো। এটা এমন হতে পারতো, যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি বিশ্ব কর্তৃপক্ষের সামরিক বাহিনী গঠন করার ব্যাপারে বিভিন্ন জাতিসমূহ জাতীয় রক্ষী বাহিনী নিয়োজিত করতো। এর ফলে জাতীয় সংহতিও বজায় রাখা সম্ভব হোত এবং সংকটকালীন মুহূর্তে ঐসব বাহিনী বিশ্ব-কর্তৃপক্ষকে ছেড়ে জাতীয় সরকারের প্রতি দায়িত্ব পালন করত।

ঐ ধরনের বিপদ অতিক্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য বিশ্ব-শাসনতন্ত্রের একটা মোটামুটি কাঠামো দেয়া যেতে পারে। অবশ্য এটা পরামর্শ বৈ আর কিছু নয়। জোর দিয়েই বলছি, যে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্দেশ্য আমার নেই। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু একটা বিশ্ব-শাসনতন্ত্র উপস্থাপিত করা যার মাধ্যমে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা রোধ করা যায়।

কর্মপরিচালনার জন্যে বিশ্ব কর্তৃপক্ষের একটা আইন পরিষদ অবশ্যই থাকতে হবে, আর থাকতে হবে কর্ম পরিচালক ও দুর্বার ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক শক্তি এবং তা একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শর্ত। তা গঠন করা খুবই কষ্টকর—সুতরাং এ নিয়েই আমি প্রথমতঃ কিছু বলবো।

BanglaBook.org

আভ্যন্তরীণ পুলিশী দায়িত্ব পালনের জন্যে যতখানি দরকার শুধু ততখানিই জাতীয় সামরিক শক্তি রাখার ব্যাপারে সমস্ত জাতিসমূহের মেনে নিতে হবে। কোন জাতিকেই পারমাণবিক অথবা ব্যাপক ধ্বংসের অস্ত্র রাখতে দেওয়া উচিত হবে না; বিশ্বকর্তৃপক্ষের প্রতিটি দেশেই লোক নিয়োগের ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র তৈরীর ক্ষমতা স্বীকার করে নিতে হবে। যখন বিভিন্ন জাতিসমূহের নিরস্ত্রীকরণ অবশ্যই করতে হবে তখন বিশ্ব-কর্তৃপক্ষের সামরিক বাহিনী খুব বড় হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং এর আওতাভুক্ত কোন জাতির উপরে অনর্থক খরচের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া অনুচিত হবে। আন্তর্জাতিক বাহিনীর মধ্যে জাতীয় আনুগত্য যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে তার জন্যে প্রয়োজন হবে বেশ বড় রকমের ইউনিটসমূহের মধ্যে নানা জাতির বাহিনীকে মিশ্রিত করে দেওয়া। এশীয়, আফ্রিকান কিংবা আমেরিকান বাহিনী বলে কিছু থাকতে দেওয়া উচিত হবে না বরং সর্বত্র সকলের সমপরিমাণ মিশ্রবাহিনী থাকতে হবে। ঊর্ধ্বতন পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে ছোট ছোট দেশসমূহের বাহিনীর হাতে যারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নেওয়ার আশা পোষণ করবে না। অবশ্য, বিশ্বসরকারের তদন্ত করার অধিকার থাকতে হবে যার ফলে নিরস্ত্রীকরণ শর্তগুলো যথানিয়মে পালন করা হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করা যায়।

আইন পরিষদের শাসনতন্ত্র হবে ফেডারেল টাইপ। বিভিন্ন জাতি-সমূহের যুদ্ধ অথবা শান্তির বিষয় ছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা সংরক্ষণের অধিকার থাকবে। ইউনিটসমূহের অসমান আকারের জন্যে ফেডারেল পদ্ধতিতে একটা সমস্যা থেকে যায়। প্রতিটি ইউনিটের কি আলোচনার ব্যাপারে একই সমান অধিকার থাকবে? নাকি, ভোটের ক্ষমতা জনসংখ্যার অনুপাতে হবে? সবাই জানেন যে আমেরিকায় বেশ কৌশলের সাথে এ সমস্যাটির মীমাংসা হয়েছে—সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ নীতিতে কোন ভেদ নেই। আমার ধারণা, অন্য ধরনের কোন নীতি বিশ্ব-আইন সভার সংগঠনে অধিক মাত্রায় স্বয়ংক্রিয় হোত। আমি মনে করি প্রায় সমপরিমাণ লোকসংখ্যার ভিত্তিতে অধীনস্থ ফেডারেশন-সমূহ গঠিত হওয়া উচিত। যতদূর সম্ভব, এগুলোর গঠন এমনভাবে হওয়া উচিত যেন, সমজাতীয়তা ও সমপরিমাণ স্বার্থ মোটামুটিভাবে

BanglaBook.org

সংরক্ষিত হয়। কয়েকটি রাষ্ট্র যদি অধীনস্থ ফেডারেশনের যে কোন একটিতে সংঘবদ্ধ হয় তাহলে বিশ্বকর্তৃপক্ষ শুধু তাদের বাহ্যিক কার্যকলাপের প্রতিই দৃষ্টি রাখবে—বিভিন্ন রাষ্ট্রের একই ফেডারেশন-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে নয়। অবশ্য যদি যুদ্ধের বিপদ জড়িত না থাকে কিংবা শাসন-তন্ত্রের বরখেলাপ না হয়।

এসব ফেডারেশন গঠনের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে যে সময়ে শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছিল এর সাথে অমিল থাকবে। বর্তমান কালে যদি তা রচিত হোত তাহলে হয়ত নিম্নলিখিত ধরনের ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারতো : (১) চীন, (২) ভারত ও সিংহল, (৩) জাপান ও ইন্দোনেশিয়া, (৪) পাকিস্তান থেকে মরক্কো পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম জগৎ, (৫) বিষুব রেখার সন্নিহিত আফ্রিকা, (৬) রাশিয়া ও অন্যান্য ছোটখাটো কম্যুনিস্ট দেশসমূহ, (৭) পশ্চিম ইউরোপ, ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যাণ্ড, (৮) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা, (৯) ল্যাটিন আমেরিকা। অন্যান্য যে সমস্ত দেশ এ হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, সেগুলো নিয়ে সমস্যার কথা। যেমন যুগোশ্লাভিয়া, ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও কোরিয়া। আগে থেকেই অনুমান করা শক্ত ঐ সব দেশের জন্যে কী ব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো হোত। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বিশ্বআইন পরিষদে প্রতিনিধত্ব করার ব্যাপারে প্রতিটি ফেডারেশনকেই অধিকার দেওয়া উচিত। বিশ্ব-শাসনতন্ত্র ও প্রতিটি অধীনস্থ ফেডারেশন শাসনতন্ত্র দুটোই এমনভাবে হতে হবে যেন উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বিধৃত হয় এবং যেন বিশ্ব-শাসনতন্ত্র অধীনস্থ ফেডারেশন শাসতন্ত্রের কর্মপরিচালনায় নিশ্চয়তা-বিধান করে। বিশ্বসরকার অধীনস্থ ফেডারেশনসমূহের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য-গুলোর শাসনতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি সমর্থন করতে হবে এবং তা শুধু তখনই হস্তক্ষেপ করতে পারবে যখন অধীনস্থ ফেডারেশনসমূহ কোন প্রকার অশাসনতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত হয় এবং একই নীতি থাকবে অধীনস্থ ফেডারেশন ও এর অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে।

বিশ্বআইন পরিষদের কি কি ক্ষমতা থাকবে? প্রথমতঃ, আইন পরিষদ স্বীকৃতি না দিলে কোন সন্ধিই কার্যকরী হবে না এবং প্রচলিত সন্ধিসমূহের প্রয়োজন বোধে পূর্ণ বিবেচনা করার ক্ষমতা আইন পরিষদের থাকবে। উগ্র জাতীয়তাবাদী শিক্ষাব্যবস্থা যদি শান্তির জন্য বিপদস্ব রূপ

BanglaBook.org

বলে বিবেচিত হয় তখন বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এর থাকবে।

একজন কর্মাধ্যক্ষ থাকতে হবে যিনি আমার মতে, আইন পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন। সামরিক বাহিনী পোষণ করা ছাড়াও আইন পরিষদের এ ক্ষমতাও থাকতে হবে যেন বিশেষ কোন জাতীয় রাষ্ট্র কিংবা সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ বিশ্ব-শাসনতন্ত্র অমান্য করলে শাস্তি বিধান করতে পারে।

আর একটা মূল্যবান বিষয় রয়েছে যা হল আন্তর্জাতিক আইন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। হেগ্ বিচারালয়ের মত একটা আইনসম্মত সংস্থা থাকা উচিত যার ক্ষমতা থাকবে জাতীয় আদালতগুলোর অনুরূপ। আমি মনে করি যার যার নিজেদের দেশে অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্যে কুখ্যাত ব্যক্তিদের শায়েস্তা করার জন্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন থাকা উচিত। ন্যুরেমবুর্গ বিচারে যে শাস্তি বিধান করা হয়েছিল এর মধ্যে নিহিত ছিল যুদ্ধে বিজয়ীদের কার্যকলাপ এবং এর মধ্যে সত্যিকারের বিচার ছিল কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া খুবই কষ্টকর। কেননা এটা সুস্পষ্ট ছিল যে, এমন ধরনের কোন আইনসম্মত ব্যবস্থা ছিল না যার ফলে অন্ততঃ কিছুসংখ্যক যুদ্ধের ব্যাপারে নিন্দিত লোককে শাস্তি দেওয়া যেতো।

আমি মনে করি ঐ ধরনের আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি হ্রাস করার ব্যাপারে সফলতা যদি অর্জন করতে হয় তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্যে রীতিমতভাবে অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। যতদিন পর্যন্ত ধনী ও গরীব দেশের অস্তিত্ব থাকে ততদিন এক পক্ষে থাকবে ঈর্ষা ও অপরপক্ষে থাকবে অর্থনৈতিক নিপীড়ন। তাহলে দেখা যাচ্ছে নিরাপত্তা বিধান ও শান্তির নিশ্চয়তার জন্যে অর্থনৈতিক সমতা অর্জনের প্রচেষ্টা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে। বিশ্বসরকার গঠনের বিরুদ্ধে বহু জোরালো আপত্তি রয়েছে এবং এগুলো কোন্ ধরনের তা নির্ধারণ করা নিষ্প্রয়োজন। তবু এটা সত্য যে, এর বিরোধিতা রয়েছে ব্যাপক আকারে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমি এ নিয়ে আলোচনা করবো।

BanglaBook.org

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বসরকার অপছন্দের কারণ

বিশ্বসরকারের পক্ষে প্রধান যুক্তি হোল—যদি তা যথাযোগ্যভাবে গঠিত হয় নিঃসন্দেহে তা যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম। যাহোক আন্তর্জাতিক সংস্থা বলে অভিহিত হতে পারে এমন ধরনের একটা বিশ্বসরকার সহজেই গঠন করা যাবে; কিন্তু তা সফলতার সাথে যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হবে না। ঐ ধরনের সরকারকে বিশ্বসরকারের কর্তৃত্বাধীন সামরিক বাহিনী থাকার মত বিরোধিতার মোকাবেলা করতে হবে না। যেহেতু, এটা হচ্ছে যুদ্ধকে দীর্ঘকাল স্থায়ী প্রতিরোধের একটা প্রয়োজনীয় শর্ত, আমি বিশ্বসরকারের মর্যাদা কোনক্রমেই খাটো করার পক্ষপাতী নই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিবৃত ব্যবস্থার প্রতি যে সব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, আমি এখন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রচণ্ডতম বিরোধিতার বেশ পরিমাণ উৎস হচ্ছে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত ভাবালুতা। আমরা যখন বলি—'ব্রিটেন কখনো কোন অবস্থায়ই দাসত্বকে মেনে নেবে না; তখন আমাদের হৃদয় অহংকারে ভরে উঠে এবং খোলাখুলিভাবে তা না বললেও, আমরা অনুভব করি যে দাসত্বকে মেনে নিতে আমাদের আপত্তি নেই যদি অন্য কোন দেশের বিরুদ্ধে অপরাধ করার যথেচ্ছ ক্ষমতা আমাদের দেওয়া না হয়। গত দেড়শো বছর ধরে জাতীয় স্বাধীনতার চেতনা দ্রুততার সাথে বেড়ে চলেছে এবং বিশ্ব-সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে এ ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বাধাহীন বন্ধনহীন স্বাধীনতার পক্ষে যারা যুক্তি দেখায় ওরা এটা বুঝে না যে একই কারণে দুর্দমনীয় ব্যক্তি-স্বাধীনতার যৌক্তিকতাও থাকে। স্বাধীনতার প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে প্যাট্রিক হেন্‌রী বা অন্য কারো কাছে আমি নতি স্বীকার করবো না। কিন্তু যদি যতখানি সম্ভব ততখানি স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় তাহলে

BanglaBook.org

অন্যের স্বাধীনতার উপরে তীব্র আঘাত দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা থাকতে হবে। বিভিন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যা স্বীকৃত তা হচ্ছে হত্যা সর্বক্ষেত্রে বেআইনী। হত্যার বিরুদ্ধে যে আইন রয়েছে তা যদি নাকচ করে দেওয়া হোত তাহলে হত্যাকারী ছাড়া আর সকলের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়ে যেতো। এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত্যাকারী-দের স্বাধীনতাও হ্রাস পেতো, কেননা ওরাও শীঘ্রই নিহত হোত। কিছু-সংখ্যক অরাজকতা সৃষ্টিকারী ছাড়া প্রত্যেকেই স্বীকার করবে যে, ব্যক্তি বিশেষ ও তার জাতীয় রাষ্ট্রের সম্পর্ক এ এমন ধরনের অবস্থায় নেমে আসতে বাধ্য। তবে এ কথাটা জাতি বিশেষের রাষ্ট্রসমূহ ও বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে মেনে নিতে প্রচুর আপত্তি রয়েছে।

এটা সত্যি কথা যে, গ্রোটিয়াস্-এর আমল থেকেই একটা আন্তর্জাতিক আইন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা চলে আসছে। ঐ সব চেষ্টা সম্পূর্ণ-ভাবে প্রশংসনীয় এবং আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপারে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে এবং তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বটে। আইন কার্যকরী করা না গেলে তা নিতান্তই হাস্যকর এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ করা অসম্ভব যদি প্রতিটি রাষ্ট্রই বিরাট অস্ত্রাগারের মালিক থাকে। বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহ বর্তমানে যখনই প্রয়োজন বোধ করে অন্যান্য রাষ্ট্রের অধিকারীদের হত্যা করার সুযোগ গ্রহণ করে। যদিও এ ধরনের স্বাধীনতা ছদ্মবেশ ধারণ করে ন্যায় ও বিচারের নামে নিজেদের বীরোচিত মৃত্যুবরণ বলে বুঝতে চায়। দেশপ্রেমিকেরা নিজেদের দেশের জন্যে মৃত্যুবরণের কথাই শুধু বলে—কখনো বলে না নিজেদের দেশের জন্যে হত্যা করার কথা।

আজ অবধি যুদ্ধ মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। আমাদের অনুভূতি ও কল্পনার মাধ্যমে এ কথাটা বুঝে ওঠা কষ্টকর যে, বর্তমানকালীন অরাজকতাপূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা শুধু মৃতদেহের স্বাধী-নতার ফলশ্রুতি হতে পারে। বর্তমানে যা আছে তার চেয়ে ঢের বেশী স্বাধীনতা পৃথিবীর জন্যে ছিল সম্ভবপর যদি যুদ্ধ প্রতিরোধ করার মত সংস্থার প্রতিষ্ঠা করা যেতো এবং ঠিক তা তেমন হতে পারতো যেমন ব্যক্তিবিশেষের হত্যা রোধ করার মাধ্যমে অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন করা যায়।

BanglaBook.org

তথাপি যতক্ষণ জাতীয়তাবাদের ভাবালুতা বর্তমান অবস্থার মতো জোরদার থাকে ততক্ষণ অনেক ব্যক্তির কাছে জাতীয় সার্বভৌমিক প্রতিবন্ধকতা আপত্তিকর বলেই মনে হতে থাকবে। যেমন ধরুন সারা বিশ্বের জন্যে শুধু একটা নৌবাহিনীর যাতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যায়ক্রমে এর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হওয়ার কথা। তখন দেশপ্রেমিক অধিকাংশ বৃটেনরা বিস্মিত হয়ে বলতো—'কি, নেলসন যে নৌবাহিনীর গৌরবের সাথে পরিচালনা করেছিলেন, তা আজ নিয়ম মত একজন রাশ্যান কর্তৃক নির্দেশিত হবে? ছেড়ে দাও ওসব কথা।" এবং এ বিস্ময় প্রকাশের পরেই শুরু করবেন অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন। ওরা বলতে থাকবেন যে, এ ধরনের আন্তর্জাতিক বাহিনীকে তার নিজের দেশের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হতে পারে। অনেক দেশই কখনো কখনো এমন ধরনের কাজ করেছে যা সম্ভাব্য বিশ্বসরকারকে অপরাধমূলক বলে অভিহিত করতে হবে এবং এ সম্পর্কে সাংঘাতিক অপরাধীরা 'লিবারেল' বলে প্রশংসা পেয়ে আসছে। ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল বায়রন ও হাইনে-এর নেপোলিয়নের স্তুতি। বিশ্বসরকার গঠনের সম্ভাবনা কার্যকরী করার পূর্বে মানুষকে বুঝানো প্রয়োজন হবে যে, মানুষ-বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র থাকা অবস্থায় আন্তর্জাতিক অরাজকতা অসম্ভব। এ হচ্ছে একটা জটিল সমস্যা এবং শক্তিশালী সরকারসমূহের বিরোধিতা তা সহজ হতে পারে না।

বিশেষতঃ কম্যুনিস্ট দেশসমূহের অন্য একটা আপত্তি রয়েছে যা বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তা হচ্ছে যে বিশ্বসরকার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত করবে না। যতদিন পর্যন্ত কম্যুনিস্ট ও অকম্যুনিস্টদের মধ্যে বিরোধিতা বর্তমানের মতো চরম আকারে থাকে ততদিন আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যাপারে সমর্থন আদায় করা খুবই কষ্টকর হবে। যার ফলে বিশেষ কোন জাতিকে একজোট থেকে অন্য জোটে যোগদান থেকে বিরত রাখা যাবে। অবশ্য এটা আইন করে দেওয়া সহজ হবে যে, প্রতিটি জাতিই নিজের পছন্দমত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে; কিন্তু এর প্রতি সম্মান দেখানোর ব্যাপারে রাজী করানো খুবই কষ্টকর হবে।

বিশ্বসরকার গঠন করতে হলে বর্তমানে যা আছে তারচেয়ে বেশী পারস্পরিক সহিষ্ণুতা বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে থাকতে হবে। এর জন্য

BanglaBook.org

নিজ নিজ দাবির একটা অংশ বর্জন করা প্রয়োজন হবে। বর্তমানে যা হচ্ছে এমন ভাবে প্রতিটি জাতিই নিজের উৎকর্ষতা নিয়ে ভাবতে পারে; কিন্তু যখন বিভিন্ন জাতি আপোষ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে মিলিত হয় তখন অত্যন্ত ভদ্রতার খাতিরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা জনসাধারণ্যে প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। বর্তমান অবস্থা চলতে থাকলে এ ধরনের সংযম আশা করা যায় না। বিশ্বসরকার গঠনের বিরুদ্ধে প্রায়ই আরেকটা যুক্তির অবতারণা করা হয়। বলা হয়ে থাকে যে, এর ফলে একটা নতুন ধরনের সামরিক নিপীড়নের বিপদ ডেকে আনা হবে। এটা অনেকে বিশ্বাস করেন। এমন কি নিশ্চয়তা আছে যার ফলে সামরিক বিপ্লব ঘটবে না ও ওরা ওদের সেনাপতিকে বিশ্বের সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত করবে না? এ ধরনের যুক্তিতে যারা বিশ্বাস করেন এরা এটা বুঝতে পারেন না যে, একই সমস্যা বর্তমানে প্রতিটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই। এ হচ্ছে মস্তবড় সমস্যা এবং বহু দেশেই অবশ্য সব চেয়ে সভ্য দেশগুলো ছাড়া, সামরিক স্বেচ্ছাচারিতা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কিন্তু পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের অসামরিক কর্তৃপক্ষ রীতিমত সফলতার সাথে সামরিক বাহিনীর উপরে নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় যখন লিংকন উত্তরাঞ্চলের বাহিনীর জন্যে প্রধান সেনাপতি নিযুক্তির ব্যবস্থা করছিলেন তখন তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল তিনি যাকে সে পদে নিযুক্ত করতে যাচ্ছেন তিনি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে পারেন। লিংকন ঐ সব সম্ভাবনা উল্লেখ করে তাকে লিখেছিলেন: "ডিক্টেটর হতে হলে জয়ী হতে হয়। আমি আপনার বিজয়ের পথ চেয়ে আছি। ফলে যদি একনায়কত্বও আসে সে ঝুঁকি আমি মেনে নেবো।" পরবর্তীকালের ঘটনা এই সিদ্ধান্তের যথার্থতার প্রমাণ বহন করে। ইংলণ্ডে 'রিফর্ম বিল'-এর ব্যাপারে ওয়েলিংটন প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন; কিন্তু নিজের অসামান্য জনপ্রিয়তা থাকা সত্ত্বেও এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি সেনাবাহিনীকে পার্লামেণ্টএর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার কথা ভাবেননি। রাশিয়ার স্ট্যালিনকে বেশ কয়েকজন সেনানীর বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করতে বেগ পেতে হয়নি। গৃহযুদ্ধের পর থেকে এবং যে গৃহযুদ্ধ সোভিয়েত সরকারের ক্ষমতার মূলসূত্র বেসামরিক কর্তৃপক্ষ সামরিক বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিষ্ঠিত। একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই

BanglaBook.org

যে, সামরিক বাহিনী সুশৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার ব্যাপারে বিশ্বসরকার জাতীয় সরকারসমূহের চেয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হবে। বিপদের সম্ভাবনা একটা রয়েছে এবং এ সম্বন্ধে বেসামরিক সরকারকে সচেতন হতে হবে কিন্তু চিন্তার এমন কোন কারণ নেই, যে সকল পদ্ধতি বিপদের সম্ভাবনা দূর করার জন্যে উন্নয়ন করা হবে সে সমস্ত বর্তমানের বৃহৎ শক্তিগুলোর চেয়ে কম কৃতকার্য হবে। সর্বত্র এবং বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর বেলায়। বিশ্বসরকারের জন্যে জোর আনুগত্যের প্রেরণার ব্যবস্থা করতে হবে। আগের অধ্যায়ে বলেছি যে, বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে বিরাট সামরিক বাহিনীর প্রতিটি ইউ-নিটের কোন একটা বিশেষ দলের পক্ষে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের সূচনা করা, অসম্ভব না হলেও রীতিমত কষ্টসাপেক্ষ।

এ ছাড়া রয়েছে বিশ্বসরকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটা মারাত্মক মন-স্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতা। তা হোল ভয় করার মত বাইরের শত্রু থাকবে না। প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক বন্ধনের ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ বিপদ কিংবা সাধারণ শত্রুতার কারণে। এটা সব চেয়ে বেশী সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তখন যখন বয়স্কলোক কতকগুলো উচ্ছৃঙ্খল শিশুদের পরিচালনার দায়িত্বে থাকে। সব কিছু শান্ত থাকলে শিশুদেরকে কোন কিছুর প্রতি অনুগত রাখা কষ্টকর; কিন্তু যখন ভয়ের কোন ঘটনা ঘটে, যেমন মারাত্মক ঝড় অথবা ভয়ঙ্কর কুকুর, শিশুরা বয়স্কদের কাছে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে ও সম্পূর্ণভাবে অনুগত হয়। ঠিক একই ধরনের ব্যাপার বয়স্কদের বেলায়ও ঘটে, তবে তা ততটা স্পষ্টভাবে নয়।

অন্য সময়ের চেয়ে দেশপ্রেম যুদ্ধকালীন সময়ে তীব্র হয়ে উঠে। এমনকি সরকারের কঠিন অনুশাসনকে মেনে নেওয়ার জন্যে তখন প্রস্তুত হয় যদিও শান্তিকালীন সময়ে তা দেখা যায় না। যেহেতু বিশ্বসরকারকে কোন বাহ্যিক আক্রমণের ভয় নেই এ ধরনের আনুগত্যের উদ্রেক করা বিশ্বসর-কারের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার মতে, শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে এটা স্থির করা উচিত যার ফলে জনসাধারণকে, দারিদ্র্য, মহামারী এবং অপুষ্টি-কর খাদ্যের সমস্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় এবং এ ছাড়াও তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন হবে যে, বিশ্বসরকারের প্রতি আনুগত্য যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বিজ্ঞানসম্মত যুদ্ধের সম্ভাবনা আবার দেখা দিতে পারে। অস্বীকার করছিনে, বিদেশী জাতিসমূহের প্রতি

BanglaBook.org

বিদ্বেষভাব থেকে সামাজিক বন্ধনের দৃঢ়তা আসে, তবু ভালো কিছু নিশ্চিত-ভাবেই এ অবস্থাকে দূর করতে সক্ষম হবে না এমনভাবে নিরাশ হওয়ার সঙ্গত কোন কারণ নেই। শুধু শিক্ষার উপরেই এ বিষয়ের সব কিছু নির্ভর-শীল। পরবর্তী কোন এক অধ্যায়ে এ বিষয়ে আবার আলোচনা করবো।

এতক্ষণ আমি বিশ্বসরকারের বিরুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক প্রতিবন্ধকতার কথাই বিশ্লেষণ করেছি; কিন্তু শিল্পবিপ্লবের সময় থেকে কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়ন, এ বিষয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের আকার বৃহত্তর হওয়ার প্রয়োজনীয়-তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছি। তাছাড়া আমাদের এ গ্রহের সীমা-বদ্ধতার দরুন ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম কারণগুলো সারা পৃথিবীর একটা সম্মিলিত সরকারের সম্ভাব্যতা প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছে। অতীতে বিশেষ কোন রাষ্ট্রের বিস্তৃতি প্রধানতঃ পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলোর ভারসাম্যতার মাধ্যমে চিহ্নিত হোত। একদিকে ছিল সরকারের ক্ষমতালিপ্সা, অন্য-দিকে ছিল শাসিতদের স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং উন্নতির যে পর্যায়ে এ দু'টো শক্তির ভারসাম্যতা স্থিরীকৃত হয়, তা বিশেষভাবে প্রয়োগ কৌশলের উপরে নির্ভরশীল। গতির সক্রিয়তা বৃদ্ধি ও অস্ত্র তৈরীর খরচের আধিক্য-তার স্বাভাবিক ঝোঁক হোল বৃহৎ আকারের সরকারসমূহের ইউনিট (একক) এর প্রতি। অস্ত্র-সস্তা হোলে কিংবা চলমান ক্ষমতা দুর্বল হলে স্থানীয় বিদ্রোহের সম্মুখে বিরাট সরকারী ইউনিট অস্থায়ী হতে বাধ্য। এ কারণে মোটামুটি বলা চলে সভ্যতার অগ্রগতিতে রাষ্ট্রসমূহের বৃহৎ আকার হওয়ার প্রবণতা রয়েছে এবং ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার দরুন রয়েছে আকারে ছোট হওয়ার প্রবণতা। পুরনো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ ঘটনাসমূহ পূর্ববর্তী-কালে পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল এমন সব রাষ্ট্রের একত্রিত হওয়ার ব্যাপার নিয়ে বিধৃত। অতীত সভ্যতা সম্বন্ধে শুধু প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমেই নয় এবং বিভিন্ন লিপিবদ্ধ ঘটনা থেকেও জানা যায়। মূলতঃ মিশরের উচচ ও নিম্ন অঞ্চল একে অপর থেকে পুরোপুরি স্বাধীন ছিল। কিন্তু দু'টো অংশ একই রাজ্যে সংযুক্ত হয় খ্রীস্টজন্মের ৩৫০০ বছর আগের কাছাকাছি কোন এক সময়ে। এই একত্রীকরণ সম্ভব হয়েছিল নীলনদীর মাধ্যমে যা মিশরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা করেছিল সহজ এবং ঐ সময়ের জন্যে—রীতিমত দ্রুততর। মেসোপটোমিয়ার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সেখানে ছিল দু'টো দল—একটি ছিল

BanglaBook.org

'সামার' আর অপরটি ছিল 'আক্কাদ'। উভয়টি ছিল জাতি, ধর্ম ও ভাষার দিক্ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পরিশেষে ওরা একত্রিত হয়েছিল বিখ্যাত বিজয়ী বীর সারগন অথবা সম্ভবতঃ তার একান্ত পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের দ্বারা। **Cambridge Ancient History** (প্রথম খণ্ড পৃঃ ৩৮) থেকে জানা যায় যে, ঐ ঘটনা ঘটেছিল খ্রীস্ট-পূর্ব ২৮৭২ সালে। এই একত্রিকরণের ফলে ক্রমশঃ গড়ে উঠে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য। আধুনিক মাপকাঠিতে যাই হোক, ঐ সময়ে এটা ছিল এক বিরাট সাম্রাজ্য। ইতিহাসের প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্য ছিল পারস্যের যা মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মত মেডিস ও পারশীয়ান নামে পূর্ববর্তীকালের দু'টো বিরোধী দলের কার্যকলাপ থেকে উৎপত্তি হয়েছিল। সমস্ত অঞ্চলের একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নির্ভর করতো যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার উপরে। ঐ সময়ে এবং বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত মানুষ, মালপত্র কিংবা খবর ইত্যাদির কোনটাই ঘোড়ার চেয়ে দ্রুততর অন্য কোন ব্যবস্থায় চলাচল করতে পারতো না। দীর্ঘতম সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে পারস্যবাসীরাই সর্বপ্রথম এবং বিশেষ করে 'সার্ডিস থেকে সুজা' পর্যন্ত ১৫০০০ মাইল সড়ক এর প্রমাণ, ঘোড় সওয়ার খবর আদান-প্রদানকারী এক মাসে যে পথ অতিক্রম করতে পারতো সেনাবাহিনীর পক্ষে তা লাগতো প্রায় তিন মাস কাল। ফলে দেখা গিয়েছে, আইওনিয়ান গ্রীকেরা যখন পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ওরা তখন তার প্রস্তুতির জন্যে প্রচুর সময় পেয়েছিল যদিও বেশ কষ্টের সাথে পারসিকরা শেষ পর্যন্ত ওদেরকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। পারসিকদের সড়ক-নির্ভরশীলতার উত্তরাধিকার ছিল মেসিডনবাসীরা কিন্তু এর সম্পূর্ণতা সাধিত হয় রোমীয়দের হাতে। রোম সাম্রাজ্য পতনের পূর্ব পর্যন্ত রোমীয়রা তাদের শাসিত অঞ্চলসমূহের জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন বিশ্বসরকার গঠনের ব্যাপারে এ নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করা দরকার। বৃটেন থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি সীমান্ত অথবা কাস্টমস্-এর বিধি-নিষেধের সম্মুখীন না হয়েও ভ্রমণ করতে পারতো। এ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা ছিল সুসংহত এবং বহুদিন যাবৎ মনে হয়েছিল যে রোমীয়দের বাইরের শত্রু থেকে আক্রান্ত হওয়ার কোন ভয় নেই। রোম-এর পতনের সাথে সাথে সূত্রপাত হোল একটা বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়া বা সভ্যতার

BanglaBook.org

প্রসারে আজ পর্যন্ত চিহ্নিত হয়ে আসছে। পূর্বের সংহত সরকারের স্থানে জন্ম নিল অনেকগুলো পারস্পরিক সংঘর্ষে লিপ্ত ছোট ছোট রাষ্ট্রসমূহের। সভ্যতার অবনতি হোল চরম পর্যায়ে এবং যে সমস্ত সড়কসমূহের উপরে রোমীয় শক্তি ছিল নির্ভরশীল সেগুলো অযত্নের ফলে হোল ক্ষতিগ্রস্ত।

যাহোক ক্রমশঃ অধিকতর সভ্য পদ্ধতির জন্যে শুরু হোল আন্দোলন। ইংলণ্ডে বিভিন্ন রাজন্যবর্গ বিশেষ করে মার্সিয়া ও ওয়েসেক্স যেখানে রয়েছে সেখানকার রাজন্যবর্গ বর্তমানকালীন রাশিয়া ও আমেরিকার মত পরস্পরকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতো। মহান আলফ্রেড তাদেরকে সংহতিতে আবদ্ধ করেন প্রায় সাতশো বছর পরে—ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের বহু শতাব্দীর সংঘর্ষ সমাপ্ত হয় নিতান্ত আকস্মিকভাবে রাজ বংশজাত দুর্ঘটনায়। রাণী প্রথম এলিজাবেথ-এর যদি সন্তানাদি থাকতো তাহলে সম্ভবতঃ আমাদের আজো বেন্‌কবার্ন' ও ফ্লাডেনিফল্ড-এর সাথে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হোত।

গোলাবারুদের আবিষ্কার শুধু বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের পরিধিই বৃদ্ধি করে নাই বরং প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জন্যেও বিরাট ক্ষমতা যুগিয়েছে। দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতাবানদের অরাজকতার সমাপ্তি হয় পদাতিক বাহিনীর সূত্রপাতে।

ইংলণ্ডের সপ্তম হেনরী, ফ্রান্স-এর রিচ্‌লু, স্পেনের ফার্দিনান্দ এবং ইসাবেলা সর্বপ্রথম নিজেদের সমস্ত শাসিত অঞ্চলে আভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নতুন সমর কৌশলের রাজনৈতিক ফলাফলের এটা হোল উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। যদিও ফ্রান্স ও স্পেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল গোলাবারুদের মাধ্যমে তবু এর ফলে এমন কোন কলা-কৌশলের উদ্ভব হয়নি যা বিশ্বসরকার গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজন হতে পারে। আর ঐ সব উদ্ভব হয়েছে আমাদের কালেই। প্রথম প্রয়োজনীয় সোপান ছিল দ্রুততার সাথে খবরের আদান-প্রদান।

টেলিগ্রাফ আবিষ্কার হওয়ার আগে রাষ্ট্রদূতদের পক্ষে স্বাভাবিক কারণেই অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করা সম্ভব ছিল, কেননা যে দেশে তার কর্মস্থল সেখানকার অবস্থা অনুযায়ী তিনি তার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারতেন এবং ঐ সবই তার নিজের দেশের কাছে থাকতো অজানা। রেলপথেরও ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা। কেউ যদি এমন ধারণা পোষণ করেন যে, রেললাইনের সুবিধা থাকলে নেপোলিয়ন

BanglaBook.org

১৮১২ সালে রাশিয়াকে পরাস্ত করতে পারতেন তাহলে বোধ হয় তা অন্যায় হবে না। কিন্তু আমাদের শতাব্দীকালে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে রেলওয়ে কিংবা টেলিগ্রাম তুলনায় অনেক বেশী দরকারী। সাম্প্রতিক পরিবর্তনের মধ্যে সর্বপ্রথম হোল আকাশ বিজয় যা কয়েক দিনের ভেতরে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সৈন্য বাহিনীর চলাচল সম্ভব করে তুলেছে। পারমাণবিক অস্ত্রের আবিষ্কার আকাশ বিজয়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং এর পরিবহনের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যবহার যাত্রাপথকে এত কম সময়ের মধ্যে সম্ভবপর করে যা নগণ্যই বলা চলে।

এসব কারিগরি জ্ঞানের উন্নয়ন যদিও বর্তমান আন্তর্জাতিক অরাজকতাকে পূর্বের চেয়ে সীমাহীনভাবে মারাত্মক করে তুলেছে, তবু বিশ্ব-সরকার গঠনের সম্ভাবনাকেও করে তুলেছে বিজ্ঞানসম্মত। কেননা এখন সে সরকার সর্বত্র যে কোন ধরনের সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রকৃত প্রস্তাবে অসম্ভব করে ফেলবে। নতুন ধরনের অবস্থা প্রধানতঃ তিনটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। প্রথমতঃ এবং এগুলোর মধ্যে যা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য, তা হচ্ছে আধুনিক পারমাণবিক অস্ত্রের সুদূরপ্রসারী ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা ; দ্বিতীয়তঃ, চূড়ান্ত তৎপরতার সাথে লক্ষ্যবস্তু আক্রমণ করার শক্তি ; তৃতীয়তঃ, ওগুলোর অপরিমেয় খরচ। এ সমস্তই একটা স্থায়ী রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে। আজ পর্যন্ত এ সম্ভাব্য আয়তন পৃথিবীর ভূমিতেই সীমাবদ্ধ কিন্তু অচিরেই তা চন্দ্রে ও অন্যান্য গ্রহে বিস্তারিত হয়ে পড়বে।

আলোচ্য বিষয়গুলো কেবলই সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, কিন্তু যদি মানবজাতি নিজেদের ধ্বংসের ব্যবস্থা না করে তা হলেই তা সম্ভবপর। রাজনীতির আঙ্গিক মূল্যায়নের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ঝোঁক ধ্বংসের পথকে আরো প্রশস্ত করবে। কেননা আধুনিক মারণাস্ত্র সে সমস্ত সেকেলে ও অর্থহীন করে তুলেছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

অষ্টম অধ্যায়

শান্তি অর্জনের পথে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পদক্ষেপ

শান্তি অর্জনের প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহ একটা শিশুর প্রথম বিক্ষিপ্ত ও কম্পিত চরণের মত অবশ্যই নগণ্য ও সন্দেহজনক হবে। আকাঙ্ক্ষিত সব কিছু আলোচনার উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি শুধু ঐ সব বিষয়ই আলোচনা করবো যা অল্প সময়ের মধ্যে মধ্যস্থকারীদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভবপর।

প্রথমেই যা প্রয়োজন, তা হোল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিতর্কের স্বতন্ত্র পরিবেশের। বর্তমানের বিতর্কসমূহ পরিচালিত হচ্ছে মল্লযুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। প্রত্যেক পক্ষই মনে করে, সমঝোতায় পৌঁছানো আসল উদ্দেশ্য নয়, আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজয়ী হওয়া এবং এর জন্যে প্রচেষ্টা চলছে যতখানি প্রচার অভিযান চালিয়ে পৃথিবীর বাকী অংশকে বশীভূত করা যায় কিংবা অন্য পক্ষ থেকে সুবিধা আদায় করে শক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট করা যায়, কেননা এর ফলেই অনুকূল গতি নির্ধারিত করা সম্ভবপর। এক পক্ষও স্মরণ করে না যে মানুষের ভবিষ্যৎ বিপর্যস্ত এবং যে কোন ধরনের চুক্তি একেবারে না হওয়ার চেয়ে অন্ততঃ কিছুটা হওয়া কল্যাণকর। উদাহরণস্বরূপ ধরে নেওয়া যাক, দীর্ঘদিন বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য অপোষ-আলোচনার কথা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েই মেনে নিয়েছে যে, নতুন কোন শক্তির হাতে পারমাণবিক অস্ত্র দেওয়া শুধু পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকিকেই বাড়িয়ে দেবে। আবার উভয় পক্ষই স্বীকার করেছে, নতুন শক্তিসমূহের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র ছড়িয়ে পড়া আসন্ন হয়ে উঠেছে। একটা বিষয়ে উভয়েরই কোন দ্বিমত নেই যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করা সম্ভবপর হলে এর প্রসারতাকেও প্রতিরোধ করা যাবে।

BanglaBook.org

এ সমস্ত আলোচনার সূত্র থেকে উভয় পক্ষই অনুভব করছে যে, শুধু বিস্ফোরণ পরীক্ষা বন্ধ করাই নয় বরং এ বিষয়ে বিজড়িত প্রত্যেক শক্তিকেই তা নিষিদ্ধ করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আপোষ-আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল বেশ কিছুটা আশানুরূপভাবে। এমনকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা যৌথভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, কোথাও বিস্ফোরণ পরীক্ষা করা হলে অপর কারো কাছে তা অজানা থাকবে না। ফলে আমেরিকান সরকার ঘোষণা করলো যে, তার ভূগর্ভস্থ বিস্ফোরণের প্রয়োজন রয়েছে, কেননা তা সহজে অন্য কারো পক্ষে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নয়।

কয়েক বছর আপোষ আলোচনার পরে এ বাধাকেও অতিক্রম করা হয়। সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করলেন যে, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের কাজ জাতিসংঘের বিশেষ এক ব্যক্তির নির্দেশে পরিচালিত হওয়া সঙ্গত হবে না বরং প্রাচ্যের একজন, পাশ্চাত্যের একজন ও নিরপেক্ষ ভোটের একজন—সর্বমোট তিনজনের মাধ্যমে তা হওয়া উচিত এবং আরো ঘোষণা করেন যে, শুধু তিনজনের পূর্ণ সম্মতিক্রমে কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হবে। আশঙ্কা সত্যই হোল—বছরের পর বছর ধরে যে আপোষ-আলোচনা রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে চলছিল তা ব্যর্থ হয়ে গেলো—রাশিয়া পুনরায় বিস্ফোরণ পরীক্ষা শুরু করে দিল। এর ফলে যদি কেউ মনে করে যে, উভয় পক্ষের কারো চুক্তির মাধ্যমে বিস্ফোরণ পরীক্ষা বন্ধ করার বিষয়ে আন্তরিকতা ছিল না এবং সব কিছুই ছিল শুধু প্রহসন মাত্র, তাহলে বোধ করি অন্যায় হবে না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উত্তেজনা হ্রাস করতে হলে আপোষ-আলোচনাকারীদের অবশ্যই একে অপরকে বুদ্ধির দৌড়ে পরাজিত করার উদ্দেশ্য ত্যাগ করতে হবে। বিপজ্জনক পূর্বাবস্থার দীর্ঘসূত্রতাকেও বাধা দিতে হবে এবং পুরোপুরি দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে সমস্যার সমাধান করতে হবে। এ কথাটা মেনে নিতেই হবে—কোন চুক্তি উভয় পক্ষেরই পুরোপুরি স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারে না। লক্ষ্য থাকতে হবে যেন চুক্তিসমূহ ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন করতে না পারে এবং নিশ্চিতভাবেই যুদ্ধের ঝুঁকি কমিয়ে দেবে। আমি শুধু একটি সমস্যাই দেখছি যা আপোষকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আর এটা হচ্ছে উভয় পক্ষেরই পারমাণবিক যুদ্ধের অর্থহীন আতঙ্ক সম্বন্ধে সচেতনতা। বর্তমানে প্রতি পক্ষই

BanglaBook.org

মনে করেন যে, স্নায়ুযুদ্ধের সফলতার জন্যে যা প্রয়োজন তা হোল অনর্থক যুদ্ধ জয়ের ভান করা। শুধু তাই নয়—এ ছাড়া রয়েছে স্নায়ুযুদ্ধে সফলতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা ও বড়ো বড়ো কথা শুনিয়ে এদের মৃত্যুর পথে টেনে দেওয়া। আর এ সবই যে নিছক প্রতারণামূলক তা বিভিন্ন সরকারের অবশ্যই জানা রয়েছে। একপক্ষ ঘোষণা করে—'আমরা গরম লড়াইয়ে জয়ী হোব', অপর পক্ষ তিরস্কার করে বলে—'আমরা তোমাদের ধ্বংস করে ছাড়বো।' স্বাভাবিকভাবেই ঐ সমস্ত বিবৃতি ভীতি-প্রদর্শিত যে কোন পক্ষেরই বিবদমান ভয়াবহতাকে বাড়িয়ে তোলে। শান্তি অর্জনের পদক্ষেপ চিহ্নিত করার প্রয়োজনে উভয় পক্ষেরই এ কথাটা মেনে নেয়া উচিত যে, এর ফলে এদের সকলেরই জন্যে রয়েছে বিপদের বিভীষিকা; আর এদের সত্যিকারের দুশমন অপর কোন পক্ষ নয় বরং দুশমন হচ্ছে মানুষ মারার সমরাস্ত্র এবং যা উভয়েরই হস্তগত। আর এ বিষয়টা মেনে নিলে সমস্যার রকমফের হয়ে যেতো। এখন আর একে অপরকে বুদ্ধির দৌড়ে পরাস্ত করা কিংবা নিজের বিজয় সম্বন্ধে প্ররোচিত করার সময় নেই। এখন প্রথম সমস্যাই হোল সকলের জন্যে গ্রহণযোগ্য এমন সব ব্যবস্থা খুঁজে বের করা—তা যত নগণ্যই হোক না কেন—যার মাধ্যমে ফলপ্রদ মীমাংসা নিশ্চিত করা যাবে।

যুদ্ধংদেহী এবং শান্তিবাদী উভয় পক্ষেরই রয়েছে বিপুল পরিমাণ গলাবাজী। ফলে, উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক তা ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে কোন সাহায্য করে না। 'মৃত্যু না মুক্তি?' অধ্যায়ে এ বিষয়ে এবং এ শ্লোগান নিয়ে আগেই আমি আলোচনা করেছি। কিন্তু এর বিপরীত আরেকটা শ্লোগান পশ্চিম জার্মানের শান্তিবাদী বন্ধুরা আবিষ্কার করেছেন এবং তা হোল,—'মৃত্যুর চেয়ে কম্যুনিস্ট হওয়া শ্রেয়'। অনুমান করা হচ্ছে যে, রাশিয়ান জনমতের মধ্যে হয়তো এক শ্রেণীর লোক রয়েছেন যাদের শ্লোগান হোল: "মৃতদেহে রূপান্তরিত হওয়ার চেয়ে বরং পুঁজিবাদই শ্রেয়ঃ।" শ্লোগানগুলোর যথার্থতা পরীক্ষা করে দেখার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না, কেননা প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্যের পক্ষে শ্লোগানসমূহের যে কোনও একটা গ্রহণের প্রশ্নই উঠে না। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সত্যিকারের সমস্যা কোন একটি শ্লোগানেও সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়নি। যদি ধরে নেয়া যায় যে, উভয়ের কারো পক্ষেই সাময়িক বিজয় সম্ভব নয় তা হলে

BanglaBook.org

যুক্তিসঙ্গতভাবেই এ কথাটা আসে যে, আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে কোন প্রকার সমঝোতা একপক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপনের ভিত্তিতে অর্জিত হতে পারে না। ভীতির ভারসাম্যকে আশার ভারসাম্যে রূপান্তরিত করতে হলে চলতি ভারসাম্যের অবশ্যই সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলা যায় যে, সহ-অবস্থানের মূল্যায়ন যথার্থভাবেই হওয়া উচিত এবং মনুষ্যজাতির অস্তিত্বের জন্যে তা কোনক্রমেই কৃত্রিম হওয়া উচিত নয়। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং যতদূর সম্ভব অন্যান্য সমস্ত শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবেই ঘোষণা করতে হবে যে, পারমাণবিক যুদ্ধ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জন্যে সর্বাত্মক বিপর্যয় নিয়ে আসবে এবং পরিণামে নিরপেক্ষ দেশগুলোও রেহাই পাবে না। তা' ছাড়া, প্রাচ্য অথবা পাশ্চাত্য—এমনকি নিরপেক্ষবাদীদেরও এ যুদ্ধের ফলে এমন কিছু ঘটবে না যা ওদের পক্ষে আশানুরূপ বলে মনে করা যেতে পারবে। আমার ধারণা, আন্তরিকতা থাকলে এই ঘোষণায় তেমন কোন প্রকার অসুবিধা নেই।

উভয় পক্ষই জানেন যে, ওরা যা বলছেন তা সত্যি কিন্তু আত্মসম্মান-বোধ প্রচার অভিযান ও ক্ষমতার রাজনীতির জালে এমনভাবে আবদ্ধ যে এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথ তাদের কারো কাছে জানা নেই। আমার মনে হয় নিরপেক্ষবাদীরা যদি এমন ধরনের ঘোষণার ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাহলে তা অস্বীকার করার মতন অসৌজন্যতা অবশ্যই ওরা দেখাতে পারবে না।

এর পরের পদক্ষেপই হবে দুই বছরের জন্যে সামরিক তৎপরতার বিরতি এবং সে বিরতিকালে উস্কানিমূলক কার্যকলাপ থেকে নিরস্ত থাকার জন্যে উভয় পক্ষকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। উস্কানিমূলক কার্যকলাপের মধ্যে আছে পশ্চিম বার্লিনের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতা এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিউবায় হস্তক্ষেপের বিষয়। চুক্তিবদ্ধ হতে হবে যে যতখানি সম্ভব জাতি-সংঘের নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত হবে কোন্ কাজ উস্কানিমূলক, আর কোন্‌টা নয়।

দুই বছর বিরতি থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রাথমিক ব্যবস্থা এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে যেন পরবর্তী পর্যায়ের আপোষ-আলোচনার পথ এর ফলে সহজতর হয়। প্রবলভাবে বিরোধী প্রচার অভিযান থেকে

BanglaBook.org

দু'পক্ষকেই নিরস্ত হতে হবে এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এমন ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যার ফলে প্রাচ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের, পাশ্চাত্য সম্বন্ধে প্রাচ্যের যে প্রচলিত ধারণা রয়েছে, যে একের কাছে অপরটি হচ্ছে শয়তানীর অতি নাটকীয় ভয়ঙ্কর জীব, সে ধারণার হ্রাস পাবে। তাছাড়া, এমন সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যার ফলে উস্কানি ছাড়া কিংবা অনিচ্ছাকৃতভাবে যেন কোন যুদ্ধ বেঁধে যেতে না পারে।

বর্তমানকালে প্রতিপক্ষই উস্কানিহীন সংঘাতের আশংকায় সন্ত্রস্ত এবং প্রতি পক্ষেরই অপর পক্ষের গোপনীয়তা ভেদ করার জন্যে বিরাট পদ্ধতি রয়েছে যার ফলে উস্কানিহীন আক্রমণ প্রকৃত অবস্থায় সূত্রপাত হওয়ার কয়েক মিনিট আগেই সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু উভয় পক্ষেরই গোপনীয়তা আবিষ্কারের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং, একে অপরের আক্রমণ সম্বন্ধে অহেতুক সন্দেহ পোষণ করা অস্বাভাবিক নয়। এক পক্ষ যদি সত্যিই তা বিশ্বাস করে তাহলে পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। অথচ অপর পক্ষের জন্যে তা হবে উস্কানিহীন আক্রমণ। এটা হোল পারস্পরিক আতঙ্কবোধের দুঃস্বপ্ন। এর মূলে রয়েছে অস্থিরতা। আর সে অস্থিরতার ফলে সীমাহীন দুঃস্বপ্নই শুধু বেড়ে চলেছে। উভয় পক্ষই যদি 'তড়িৎ প্রতিশোধ'-এর ভিত্তিতে থাকে তাহলে মানসিক পীড়নের তীব্রতা হ্রাস পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের পরিবর্তে শুধু ভুলবশতঃই সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে। এ পরিস্থিতিতে কর্তব্য নির্ধারণ করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়—যদি একবার কোনক্রমে বিনা বাধায় সে পরিস্থিতি দানা বেঁধে উঠে। এ সমস্যার সমাধানের জন্যে প্রয়োজন হোল পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ। ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটিসমূহ বিলোপ করার মাধ্যমে বহু আগেই এ বিপদের সম্ভাবনা হ্রাস করা যেতে পারতো। আর তা যদি চরম ব্যবস্থার সামিল হয় তা হলে ঐ সব ঘাঁটিগুলো সাময়িকভাবে অব্যবহার্য করে ফেলা উচিত। কিন্তু ডুবো জাহাজকেও পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করার পরে ক্ষেপণ-ঘাঁটিগুলোর গুরুত্ব বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। অনিচ্ছাকৃত কিংবা দুর্ঘটনা সংক্রান্ত যুদ্ধের বিপদ হ্রাস করার বিষয়টি বেশ জটিল হয়ে উঠেছে এবং পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ছাড়া অন্য কোন

BanglaBook.org

কিছু শুধু আপাত উপশমকারী ব্যবস্থারই নামান্তর। আন্তরিকতার সাথে যদি উভয় পক্ষই যুদ্ধ বর্জনের চেষ্টায় ব্রতী হয় তাহলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সম-সংখ্যক সদস্যের সমবায়ে একটা কারিগরি কমিশন গঠনের প্রয়োজন। কিন্তু কমিশন কি ব্যবস্থার জন্যে সুপারিশ করবে তা স্থির করা সহজসাধ্য নয়। তবে এ কথাটা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, আপাত উপশমকারী কোন ব্যবস্থা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় এবং এ বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ। একদিকে উভয় পক্ষেরই চেষ্টা থাকতে হবে প্রত্যেকের নিজস্ব অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানের আদান-প্রদান যেন বৃদ্ধি করা যায়; অপরদিকে, পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

বিরতিকালীন সময়ে প্রধান কর্তব্য হবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য ও নিরপেক্ষ দেশসমূহ থেকে সমান সংখ্যক সদস্যের মাধ্যমে মধ্যস্থকারী কমিটি নিয়োগ করার বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত করা। আমার মনে হয় যে সুষ্ঠুভাবে কর্ম পরিচালনার নিমিত্ত ঐ কমিটি আকারে ছোট হওয়া প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—পাশ্চাত্যের ৪ জন, প্রাচ্যের ৪ জন, নিরপেক্ষ জোটের ৪ জন সদস্য নিয়ে তা গঠিত হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় অন্ততঃপক্ষে পরামর্শদানের ক্ষমতা এর থাকা উচিত।

যখনই এ কমিটি সর্বজনসম্মত কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে ব্যর্থ হবে তখনই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ উভয় দলের মতানৈক্যের কারণসমূহ জনসাধারণের অবগতির জন্যে প্রকাশ করা উচিত। বিশেষ কতকগুলো নীতির মাধ্যমে কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ নির্ধারিত হতে হবে এবং এগুলোর মধ্যে প্রথম ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় নীতি হবে যেন গৃহীত প্রস্তাবসমূহ উভয় দলের বিশেষ কারো জন্যে অধিকতর সুবিধাজনক ব্যাপার না হয়—কেননা এর ফলে তাদের ঐকমত্য অর্জনের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। যেমন, রাশিয়া পাশ্চাত্যের রেডিও অনুষ্ঠানে বাঁধাদান বন্ধ করতে হবে যদি ঐ সব রেডিও উৎকট বিরোধী প্রচার অভিযান থেকে নিরস্ত থাকে। এর পরের নীতি হতে হবে, যে সমস্ত স্থানে বিপজ্জনক সংঘাত চলছে তা বন্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। যেমন—আরব ও ইসরাইলী, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার সংঘাত। তৃতীয় নীতি হোল প্রথম দু'টো নীতির আয়ত্তে তবে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের

BanglaBook.org

প্রশ্নটি যতদূর সম্ভব মেনে নেওয়া। এ বিষয়ে যা করা সম্ভবপর তারও একটা সীমিত দিক রয়েছে। যেমন, রাশিয়া এর নিয়ন্ত্রণাধীন দেশগুলোর জন্যে ঐ সমস্ত নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে আগ্রহী হবে না। যুক্তরাষ্ট্র আবার ল্যাটিন আমেরিকার প্রশ্নে এগুলো মেনে নেবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ফরমোজা সম্বন্ধে বলা যায় যে, তথাকার অধিবাসীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি সে বিষয়ে কোন বিবরণ কখনো পাইনি। তাছাড়া এ নিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কেউ এমন কোন সুপারিশও করেনি যা শ্রদ্ধার সাথে বিবেচিত হতে পারে। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর বর্তমান উত্তেজনার হ্রাস না হচ্ছে ততদিন আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি যতই আকাঙ্ক্ষিত হোক না কেন তা বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতার রাজনীতির খপ্পরে পড়তে বাধ্য। আর এটা হচ্ছে অত্যন্ত দুঃখের কথা। তবু আমি মনে করি বৃহৎ শক্তিগুলোর পারস্পরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে তা একান্তভাবে অপরিহার্য।

বিরতিকালীন সময়ে আলোচনার অপেক্ষা রাখে এমন ধরনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আরেকটা বিষয় রয়েছে এবং তা হচ্ছে জাতিসংঘকে পুনর্গঠন ও অধিকতর শক্তিশালী করে তোলার বিষয়। জাতিসংঘের দ্বার প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্যে অবারিত থাকা দরকার এবং তা শুধু চীনের ক্ষেত্রেই নয়—যা এ মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী বরং পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর বেলায়ও তা সত্য। যা হোক, জার্মানীর সমস্যা ভিন্ন ধরনের এবং এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে আরো কিছু বলবো।

জাতিসংঘের অসম্পূর্ণতা শুধু এ জন্যে নয় যে কিছুসংখ্যক দেশ এর বহির্ভূত রয়েছে। 'ভেটো' বা বাঁধা প্রদানের ক্ষমতার প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। বিশ্বসরকার গঠনের ব্যাপারে জাতিসংঘের ভূমিকা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ হবে না যদি ভেটো প্রথা বিনা বাধায় চলতে থাকে। পক্ষান্তরে, ভেটো প্রথা রহিত করাও সম্ভব হবে না যদি জাতীয় সরকারসমূহ বর্তমানের অস্ত্রসজ্জা অব্যাহত রাখে। এ বিষয়ে এবং যা জার্মান সমস্যার বেলায়ও প্রযোজ্য, কোন সমাধানের আগে নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নের মীমাংসা হতে হবে।

জাতিসংঘের অসম্পূর্ণতার জন্যেই অন্তর্বর্তীকালীন সালিসি কমিটি

BanglaBook.org

প্রাথমিক স্তরে এ সম্পর্কে জাতিসংঘের সূচিত কর্মপদ্ধতির চেয়েও অধিকতর ফলপ্রসূ হবে। আশা করা যেতে পারে যে, যদি এ ধরনের পরামর্শ দানের ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা থাকে এবং এর কর্মপদ্ধতি প্রজ্ঞার সাথে নিষ্পন্ন হয় তাহলে সে সংস্থা যথাসময়ে এমন একটা নৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হবে যে এর প্রস্তাবসমূহ যে কারো পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব হবে না এবং প্রারম্ভেই তা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে এবং পরিণামে বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। আর ঐ ধরনের সংস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে কল্যাণকারী ভূমিকা রয়েছে তা হচ্ছে এই যে এর ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে নিরপেক্ষবাদী দেশসমূহ ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে এবং যদি বিশেষ কোন পক্ষের প্রস্তাব এরা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করে তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে নির্দিষ্ট কোন প্রশ্ন বিবেচনা করে যা উত্তম মনে হবে তা-ই সমর্থন করবে। মনে করা যেতে পারে, নিরপেক্ষবাদীরা কখনো এ দলে, কখনো সে দলে অংশ গ্রহণ করবে। যদি এক পক্ষ অপর পক্ষ নয়, নিরপেক্ষ জোটের বিরোধিতা করার মতন অবস্থায় নিপতিত হয় এবং যা উভয় পক্ষের বেলাই মাঝে-মধ্যে নিশ্চিতভাবে ঘটতে পারে, তাহলে উভয়েরই সুর আরো নরম করার ব্যাপারে সাহায্য করবে। নিরপেক্ষ জাতির কাছে অনুনয় করার বাঞ্ছনীয়তা মেনে নেয়া হলে প্রাচ্য-প্রতীচীর যে কোন আলোচনার জটিলতা বহুলাংশে কমে যাবে এবং ক্রমশঃ বিশেষ কোন পক্ষের প্রতি সীমাবদ্ধ না রেখে বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গির সমণ্বয় সাধন করতে পারবে। তাছাড়া, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে কোথাও অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে উভয়ের যুক্তিসঙ্গত আপোষ-মীমাংসার জন্যে নিরপেক্ষ জাতিসমূহের পরামর্শ অধিকতর আশার সঞ্চার করবে। বোধ করি, সুস্থবুদ্ধি জাগরিত করার ব্যাপারে নিরপেক্ষ জাতিসমূহের ও নিয়ে গৃহীত কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত প্রয়োজন হবে। এরও একটা বিরাট কারণ রয়েছে, কেননা আমি বিশ্বাস করি শান্তি রক্ষার জন্যে নিরপেক্ষদের ভূমিকাই হবে অবিসংবাদিত এবং আমি চাই যে, বৃটেন 'ন্যাটো' জোট ছেড়ে দিয়ে একটা নিরপেক্ষ জোট গঠনে উদ্যোগী হউক। স্বজাতীয় উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আত্মগরিমা বহু বৃটেনবাসীর মনে ভাবনা জাগায় যে এমন ধরনের ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে পাশ্চাত্যকে দুর্বল করে দেবে। কি আমেরিকার সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামত প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এটা অবশ্য ধাঁধার ব্যাপারও বটে যে বৃটেনদের

BanglaBook.org

নিরাপত্তার সম্ভাবনাকেও এর ফলে নিশ্চিত করে তোলা হবে। কিন্তু বৃটিশদের নিরপেক্ষ থাকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুক্তি এই যে, এর ফলে বিশ্ব-শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টা উপকৃত হবে; কেননা বৃটেন নিরপেক্ষ থেকে যা করতে পারবে, উভয় পক্ষের যে কোন একটা জোটে থেকে তা করতে সক্ষম নয়।

বর্তমান অধ্যায়ে নিরস্ত্রীকরণ কিংবা রাষ্ট্রীয় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করিনি। আমি শুধু আলোচনা করেছি সেই সব বিষয়ে যা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘাতকে হ্রাস করতে পারবে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে আলোচনা করবো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নবম অধ্যায়

নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্ন

সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ যদিও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও আকাঙ্ক্ষিত—এমন কি তা অর্জন করাও হয়তো সম্ভব—তবু স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে তা যথেষ্ট নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক কারিগরি জ্ঞান বোধগম্য থাকবে, ততক্ষণ যে কোন ধরনের প্রচণ্ড যুদ্ধের সময়ে উভয় পক্ষের পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন শুরু করে দেওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া, অতীতে শান্তি-কালীন সময়ে যে সমস্ত অস্ত্র সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়েছিল—সেগুলোর চেয়েও মারাত্মক ধরনের অস্ত্র তৈরী তখন শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এ কারণেই শুধু নিরস্ত্রীকরণ যথেষ্ট নয়, তবু এই-ই হচ্ছে একমাত্র প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা আশানুরূপ সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না।

নিরস্ত্রীকরণ যাঁরা সমর্থন করেন এদের মতে, জনপদ ধ্বংসের সমস্ত অস্ত্রই হচ্ছে নীতি-বিগর্হিত। আর নিঃসন্দেহে তা সত্যও বটে; কিন্তু তেমনি নীতি বিগর্হিত হচ্ছে তীর ও ধনুক। অবশ্য তুলনামূলক তারতম্য তো রয়েছেই। একজন মানুষকে হত্যা করা যদি অপরাধের ব্যাপার হয়, তাহলে দু'শত মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করার অপরাধ দু'শত মিলিয়ন গুণে অপরাধ। নীতিহীনতাই শুধু আধুনিক অস্ত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় যে, প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উভয় পক্ষকেই যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিতে হবে। আর এ কারণেই আধুনিক যুদ্ধের ভাবনা হচ্ছে বিরক্তিকর ও দুরভিসন্ধিমূলক। যুদ্ধ সংঘটনের নীতি প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য যে কোন পক্ষই সহ্য করে থাক না কেন—এরা সবাই বিভ্রান্ত।

যারা জয়-পরাজয় সম্বন্ধে নিশ্চিত নয় এরা নিজেদেরকে প্রবোধ দেয় এই ধারণায় যে, স্নায়ুযুদ্ধে অবশ্যই অপর পক্ষকে পরাস্ত হতে হবে।

BanglaBook.org

মিউনিক-এর পরে হিটলারের ধারণাও তাই ছিল এবং এ সম্বন্ধে তার ত্রুটিপূর্ণ হিসাব তার পতনের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। অনুরূপভাবে হিসাবের ভুলের জন্যে তার শত্রুদেরও বর্তমানকালে পরাজয় ঘটতে পারে।

এর চেয়েও মারাত্মক যুদ্ধবাজের আরেকটি দল রয়েছে। আর এরা হচ্ছে ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা জাতীয় কিংবা আদর্শগত অহমিকার ইতিহাসের শিক্ষা উপেক্ষা করে আজো মনে করেন যে, তাদের নিজেদের দলই যুদ্ধে জয়ী হবে। আমার বিশ্বাস, এ ধরনের ভিত্তিহীন ধারণা আমেরিকা ও রাশিয়ায় বহুল প্রচলিত এবং উভয় দেশেরই সরকারসমূহ আপোষ-আলোচনার ক্ষেত্রে এরূপ বিশ্বাসকেই সম্পদ বলে মনে করে।

তৃতীয় আর একটি দল রয়েছে এবং এ হচ্ছে আত্মোৎসর্গের জন্যে উন্মুখ ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের দল। এ দল মনে করে যে, কোন শুভ কাজের জন্যে লড়াই করা এবং এর জন্যে মৃত্যুবরণ করা একটা মহান কর্তব্য—এমন কি তাদের আত্মোৎসর্গের ফলে পৃথিবী যা আছে এর চেয়েও যদি মন্দ হয়ে যায়। শহীদ হওয়ার জন্যে কম প্রস্তুতির দরুন পৃথিবী যদি আরো সুখের হত—তবুও।

দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, হিরোশিমার মর্মান্তিক ঘটনার পরে এ তিনটি দল একত্র কাজ করে যাচ্ছে এবং এরাই আণবিক যুদ্ধের বিপদ হ্রাস করার প্রচেষ্টাকে যাবতীয় ব্যাহত করার ব্যাপারে এ যাবত সফলকাম হয়েছে। এমন মুহূর্তও গিয়েছে যখন সত্যি সত্যিই এ দল কিংবা অপর দল সাধারণ বুদ্ধির কিছুটা আভাস দিয়েছে, কিন্তু উভয়পক্ষ একই সময়ে কখনো তা উপলব্ধি করেনি।

নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা সভার ইতিহাস হিরোশিমা থেকে শুরু করে আজ অবধি মানব-ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনার্ত ঘটনা। হিরোশিমা ও নাগাশাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণ করার পরে ধারণা করা হয়েছিল যে, এমনকি আমেরিকায় (যখন এ ব্যাপারে তাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল) আণবিক শক্তির আন্তর্জাতিকীকরণ হবে। আমেরিকান সরকার 'লিলিয়েন থাল'কে নিযুক্ত করেছিলেন এ বিষয়ে একটা প্রস্তাবের খসড়া সরকারের বিবেচনার নিমিত্ত উপস্থাপিত করার জন্যে। এ ছিল একটা প্রশংসনীয় প্রস্তাব। কিন্তু অতঃপর স্থির করা হয়েছিল, যে, তা' অন্যান্য শক্তিগুলোর কাছে অপরিবর্তিত অবস্থায় পেশ করা যাবে না। ফলে,

BanglaBook.org

আন্তর্জাতিক বিবেচনার জন্যে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল এর নাম ছিল 'বারুক প্রস্তাব' এবং তা এমনভাবে পরিবর্তিত অবস্থায় ছিল যে রাশিয়ার পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। আর শেষ পর্যন্ত সে সন্দেহ সত্যিই হয়েছিল।

একথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় মহাসমর শেষ হওয়ার পরে আপোষ-মীমাংসা ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে স্ট্যালিন যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। মহাসমর শেষ হওয়ার বছরে কিংবা এর পরের বছরে আমেরিকা প্রচলিত অস্ত্রের ব্যবহার বিপুল পরিমাণে হ্রাস করেছিল; কিন্তু স্ট্যালিনের নিকট থেকে এ ব্যাপারে সাড়া-শব্দ পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে যদিও ইয়াল্টায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, রাশিয়া ছাড়া পূর্ব-গোলার্ধের অন্যান্য দেশসমূহে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তিনি রাশিয়ার প্রভাবান্বিত দেশসমূহে সামরিক কড়াকড়ি ও পুলিশী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপরে শুরু হোল বার্লিন প্রতিরোধ ও রাশিয়ার পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হওয়ার ঘটনা। পাশ্চাত্য তখন ঠাণ্ডা-লড়াইয়ে নেমে পড়লো এবং রাশ্যান-বিরোধী নীতিকে আরো জোরদার করে তুললো। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে যখন সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধের উত্তেজনা হ্রাসের ব্যাপারে মোটামুটি অভিযান শুরু করলো তখন পাশ্চাত্য সে দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারলো না। নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা বন্ধ করার বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একমাত্র আলোচনা সভাকালে বিস্ফোরণ বিরতি ছাড়া তেমন কিছু করা সম্ভবপর হয়নি। ১৯৪৫ সনের পরে প্রথম কয়েক বছর শুধু রাশিয়াকে যদিও এ ব্যর্থতার জন্যে প্রধানতঃ দোষী করা হয়েছিল, তবু এ কথা স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরেও কয়েক বছর পর্যন্ত খোলাখুলিভাবে বলা যায়নি।

অপরপক্ষে ক্রুশ্চেভ যখন বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণ-এর জন্যে প্রস্তাব করলেন তখন পাশ্চাত্য সে পরামর্শ অপকৌশলের অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করেছিল। পাশ্চাত্য কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন—অবশ্য তা সুস্পষ্টভাবে জন-সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়নি—'নিরস্ত্রীকরণ আলোচনার উদ্দেশ্য যে নিরস্ত্রী-করণই হওয়া উচিত তা উপলব্ধি না করে ক্রুশ্চেভ এ নিয়ে তামাশা কর-ছেন। আর এটা সঠিকভাবে জানা উচিত যে, নিরস্ত্রীকরণ কোন পক্ষেরই

BanglaBook.org

লক্ষ্য নয় এবং প্রকৃত লক্ষ্য হোল শুধু অপপ্রচারের খেলা দেখানো এবং সত্যিকারভাবে নিরস্ত্রীকরণ অর্জনের বিপদ যেন না হয় এর জন্যে উভয় পক্ষেরই ভান করা। তাঁর নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব, বর্তমানে যা আছে, এবং বিশেষতঃ তদন্তের ব্যাপারটা, মূলতঃ ত্রুটিপূর্ণ। এ কারণটাকে কেন্দ্র করেই ক্রুশ্চেভ আমাদের আপত্তি দূর করার জন্যে কোন প্রকার সংশোধনী প্রস্তাব করবে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়েই সরাসরিভাবে তা প্রত্যাখ্যান করছি।" সুতরাং এবারও ফল হোল না—যথা পূর্বং তথা পরং।

দু'পক্ষের কাছে এটা স্বীকৃত যে, প্রথম আঘাত হান্‌বার সুবিধাই হচ্ছে আসল সুবিধা। যে কোন এক পক্ষ যদি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতিপক্ষকে পারমাণবিক আঘাত দিতে পারে তাহলে প্রতিপক্ষের ক্ষতির পরিমাণ এত বিপুল পরিমাণে হবে যে সফলতার সাথে দ্বিতীয় আঘাত করা এর জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর হবে। কাহ্‌ন-এর 'থার্মোনোক্লিয়ার ওয়ার'-এ আলোচিত সমস্যাগুলোর এটা হোল অন্যতম। বহু প্রভাবশালী আমেরিকান ও পশ্চিম ইউরোপীয়ান বিশ্বাস করেন যে, এমন ধরনের উস্কানিহীন আক্রমণ যে কোন মুহূর্তে রাশিয়া পরিচালিত করতে পারে। এটা মনে করা যেতে পারে যে, এই রকম একটা ধারণা রাশিয়ারও রয়েছে এবং প্রত্যাশিত 'প্রথম আঘাত'-এর বিরুদ্ধে সতর্কতা পাশ্চাত্যের মত রাশিয়াও অবলম্বন করেছে। এ ধরনের পারস্পরিক সতর্কতা শুধু সম্ভাব্য সংযমের বিরোধীই নয় বরং অনাকাঙ্ক্ষিত পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকেও প্রবলভাবে বাড়িয়ে তোলে। 'ইনস্‌পেক্‌শান ফর ডিস-আরমামেণ্ট' পুস্তকের সম্পাদক স্যিমুর মেলম্যান এ বিপদের সম্ভাবনা মেনে নিয়ে পরিচ্ছন্নভাবে ও জোরের সাথে বিবরণ দিয়েছেন: "নিঃসন্দেহে পারমাণবিক অস্ত্রের পরিকল্পনাকারিগণ আকস্মিকভাবে বোমাবর্ষণ প্রতিরোধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন; যেমন, ঐ ধরনের অস্ত্র কার্যকরী পর্যায়ে পৌঁছুবার আগে স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের প্রস্তুতি-পর্ব সমাধান করার প্রয়োজনীয়তা। মানবিক ভুলের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের নিশ্চয়তা নেই। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরীর ব্যাপারে হাজার হাজার লোক কাজ করে থাকে এবং তা ব্যবহারের জন্যে এর চেয়েও বেশী সংখ্যক লোক কাজ করবে, তবু মানবিক অসফলতার বিষয়টি অবজ্ঞা করা যায় না। কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিপথগামী অথবা সাময়িকভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণ

BanglaBook.org

শক্তি রহিত ব্যক্তির পক্ষে যত্রতত্র অথবা জনপদে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ ঘটানো মোটেই অসম্ভব নয়। মহাশূন্যের কোন উপগ্রহকে ক্ষেপণাস্ত্র বলে ভুল করাও বিচিত্র নয়।

সামরিক কলাকৌশল ও কারিগরি জ্ঞান দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে এতটা উন্নীত করা হয়েছে যে, ঐ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্যে শুধু একটুখানি ভুল বুঝাবুঝি প্রলয়ঙ্করী পারমাণবিক যুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাতকে ত্বরান্বিত করবে। পারমাণবিক অস্ত্র ক্রমান্বয়ে সুলভ হয়ে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন দেশের হাতে এসে পড়ছে। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান লেখকের বিবেচনায় উপরোক্ত ধরনের সম্ভাবনা সামরিক শক্তিসমূহের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত ও সুচতুর কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষমতাকে দুর্বল করে অথচ ঐ ক্ষমতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে পারস্পরিক অস্ত্রসজ্জার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার স্ট্যাটেজী।

সর্বশেষে পারস্পরিক অস্ত্রসজ্জার স্ট্যাটেজিভিত্তিক ধারণাসমূহের প্রধান ধারণাটিই মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, কেননা ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক দেশের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকবে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের বহুতর পদ্ধতি এবং আণবিক শক্তিসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কোন শহরে যদি যুদ্ধাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় তাহলে আক্রমণকারীকে সনাক্ত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়বে। আক্রমণকারীকে সনাক্ত করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে প্রতিশোধ গ্রহণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং 'আতঙ্ক সৃষ্টির ভারসাম্য' আণবিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে কার্যকরী কৌশল নয়।

যাঁদের বিরোধিতা করার জন্যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই ঐ সব ব্যক্তিরাও এমত সমর্থন করেন। যেমন ধরুন আমাদের বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রী লর্ড হেইলশ্যাম-এর কথা—যিনি বলেন যে, আজ কিংবা কাল যুদ্ধ হবেই (ডেইলী স্কেচ, আগস্ট ১১, ১৯৬০)। সি,. পি. স্নো এ ব্যাপারে আরো উৎসাহী। তিনি বলেন, "খুব বেশী হলেও দশ বছরের মধ্যে ঐ সকল বোমার কিছুসংখ্যক বিস্ফোরণ ঘটবে। বিজ্ঞানের নৈতিক পক্ষপাতিত্ব-হীনতা সুনিশ্চিত।" (মানখ্‌লী রিভিউ, ফেব্রুয়ারী ১৯৬১, পৃঃ ১৫৬)। এমনি ধরনের বহু উধৃতি আমি দিতে পারি। আর মজার ব্যাপার হচ্ছে, এরা কেউ চরমপন্থী নন।

BanglaBook.org

মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ সবের অর্থ কি? উস্কানিহীন প্রথম আক্রমণের সম্ভাবনা—তা রাশিয়া কিংবা আমেরিকা যার ক্ষেত্রেই ঘটুক না কেন, হয়তো কোন নির্দিষ্ট দিনে তা প্রবল না হতে পারে কিন্তু প্রতিদিনই ঐ ধরনের সম্ভাবনা সংযোজিত হওয়ার ফলে, শেষ পর্যন্ত তা প্রায় নিশ্চিত হয়ে পড়বে যদি নীতির কোন প্রকার পরিবর্তন সাধিত না হয়। যদি সি. পি. স্নো সঠিক বলে থাকেন এবং তা ভ্রমাত্মক বলে মনে করার কোনই হেতু নেই—তাহলে আগামী দশ বছরের মধ্যে কোন এক সময়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে হাইড্রোজেন বোমা বর্ষণ করা হবে এবং পরিণামে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে বোমাবর্ষণ হবে অথবা ঐ সময়ে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে কোন এক সময়ে বোমাবর্ষণ হবে এবং প্রতিশোধস্বরূপ রাশিয়ারও বিরুদ্ধে তা ঘটবে এবং বৃটেনে আমরা মাত্র চার মিনিটের নোটিশে কি হতে যাচ্ছে তা জানতে পারবো। আশা করা যাক, হয়তো আমেরিকার ক্ষেত্রে এই নোটিশের সময় হবে পঁশিচ মিনিট। আমরা কি ধরনের নোটিশ পাবো? আমরা নোটিশ পাবো যে আমাদের জনসংখ্যার একটা অংশ সোজাসুজি-ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং যারা বাকী থাকবে এরা ধীরে ধীরে মর্মান্তিক মৃত্যুর শিকারে পরিণত হবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, এর ফলে কেউ বৃটেনে জীবিত থাকবে না।

যতদিন তড়িৎ গতিতে প্রতিশোধ নেয়ার নীতি চলতে থাকবে তত-দিন অন্য কারো আক্রমণকে রাশিয়ান আক্রমণ বলে ভুল করার আশঙ্কা থাকবে। এই রকম ক্ষেত্রে আমরা যে আক্রমণকে প্রতিশোধমূলক বলে বিশ্বাস করবো অপরপক্ষ হয়তো তাকে উস্কানিবিহীন আক্রমণের লগ্ন বলে ধরে নেবে আর তার ফলে শুরু হয়ে যাবে সর্বাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধ। আগেও এ ধরনের ভুল কয়েকবার যে হয়নি এমন নয়। গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরে থিউল নামক স্থানে সোভিয়েত বোমারু বিমান বহরের আক্রমণ-বিধি লক্ষ্য রাখার জন্যে একটা শক্তিশালী রাডার স্টেশন রয়েছে। হাইড্রোজেন বোমা বহনকারী পাইলটদের এত নিখুঁতভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যে, সতর্কতার নির্দেশ পাওয়া মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে এরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আকাশে উড়ে যেতে পারে। বেশ কয়েকবার সতর্কতার নির্দেশ দেওয়ার পরে দেখা গিয়েছে যে, রাডারে যা লক্ষ্য করা হয়েছিল তা প্রকৃত পক্ষে রাজহাঁসের সারি। একবার তো চাঁদকে রাশিয়ান আক্রমণ বলে

BanglaBook.org

ভুল করা হয়েছিল এবং কেবল তুষার স্তূপ কর্তৃক আকস্মিকভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন প্রতিশোধমূলক আক্রমণ ব্যাহত হয়েছিল। ঐ অবস্থায় বোমারু বিমানসমূহ ধ্বংস করার যাত্রা-পথে এগিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছিল। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, দুর্ঘটনাক্রমে কোন প্রকার সংঘাত শুরু হবে না। আর এ জন্যে মনে হয় যে, ঐ ধরনের দুর্ঘটনার কথা তিনি শুনেন নি। জাতিসংঘ এসোসিয়েশন-এর নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার উপরে প্রদত্ত রিপোর্ট বেশ কিছুটা বাস্তবধর্মী (মার্চ-১৯৬১) যার উপসংহারে (১৯ পৃষ্ঠায়) বলা হয়েছে, "ভবিষ্যতে নিরস্ত্রীকরণ ছাড়া কোন পৃথিবীর অস্তিত্ব মোটেই থাকবে কিনা এ বিষয়ে আমরা সন্দিহান। আমাদের ঘাড়ে অবিশ্বাসের একটা ভূত চেপে বসেছে: একপাল বুনো হাঁস শ্বেত আর্কটিক অঞ্চলের উপর দিয়ে নীরবে উড়ে যাচ্ছে এবং সোভিয়েত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের রাডার পর্দায় সেগুলো প্রতিফলিত হচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্রের মতন। রাডার পর্দা ঐ বুনো-হাঁসকেই ক্ষেপণাস্ত্রের সারি বলে তুলে ধরছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার কিংবা সোভিয়েত ইউনিয়ন (ঘটনা বিশেষে যা হতে পারে) তৎক্ষণাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের পারমাণবিক আঘাতের প্রতিহিংসায় মেতে উঠবে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে পারমাণবিক যুদ্ধের ঝড়। অথচ হংস বলাকারা শান্ত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আর তারাই হবে শেষ যুদ্ধের একমাত্র সজীব প্রাণী। এমন ধরনের অস্বাভাবিক ছবি মোটেই অসম্ভব নয়। অযৌক্তিক ও অমানুষিক হওয়া সত্ত্বেও এটাই হচ্ছে বর্তমান কালের অসাধারণভাবে মেকী শান্তির প্রতীক। আর পারমাণবিক যুদ্ধের চূড়ান্ত যুক্তিহীনতা একটা প্রতীকের সাহায্যে বুঝানো যেতে পারে। বহুকাল আগে ক্যাপিটলের রোমানদের কাছে হংস-বলাকাদের তীক্ষ্ণ চীৎকার যে সতর্কতার বাণী বয়ে এনেছিলো, ধরে নেয়া যেতে পারে, যুদ্ধ-শঙ্কিত পৃথিবীর এই বলাকারা সেই হংস-বলাকাদেরই প্রতীক।"

মানবিক ত্রুটি ছাড়াও রয়েছে যান্ত্রিক ত্রুটির কথা। এ বিষয়ে যান্ত্রিক বিপর্যয় অত্যন্ত জটিল এবং ভুলক্রমে বোমারু বিমানসমূহ আক্রমণের যাত্রা করলে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার খবর যথাসময়ে পৌঁছুবে কিনা তা নিশ্চয় করে কেউ বলতে পারে না। যদি তা না পৌঁছায় তাহলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। এ ধরনের বিপদের ঝুঁকি নেয়ার যৌক্তিকতা

BanglaBook.org

কেউ কি বুঝিয়ে দিতে পারবে?

তথাপি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আপোষ-আলোচনাকারীরা সহজভাবে এ বিষয়টা বিবেচনা করছেন। তাহলে আমাদের ধারণা করতেই হয়, শত্রুকে সামান্যতম সুযোগ দেওয়ার চেয়ে নিজেদের জনসংখ্যার বিলুপ্তি যেন তাদের কাছে কিছুই না। এ হচ্ছে সেই 'বৈডলাম'-এর রাজনীতি। উভয় পক্ষেরই মধ্যস্থকারীরা যদি সুস্থ মস্তিষ্কের লোক হতেন তাহলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, পারমাণবিক যুদ্ধের কী ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে এবং বিপদের ঝুঁকি রয়েছে কী মারাত্মক পর্যায়ের। চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে রয়েছে যুক্তিসঙ্গতভাবে দেওয়া ও নেওয়ার নীতি। আর প্রজ্ঞা ও মানবিক দরদ তখনই শুধু উদ্বুদ্ধ হতে পারে; তা যদি না হয়, তাহলে আমাদের সন্তান-সন্ততি, বন্ধু-বান্ধব এবং আমাদের জাতির ভাগ্যে রয়েছে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ফল মৃত্যু। বর্তমানে আত্মগরিমা, ক্ষমতার প্রতি লোভ ও সীমাহীন প্রতারণা সম্ভাবনার উপরে আস্থাশীল প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের রাষ্ট্র-নায়কদের মানবতার প্রতি সুস্পষ্ট কর্তব্য পালনের ব্যাপারে অন্ধ করে ফেলেছে। ফলে, চলেছে আত্মহত্যার অপ্রতিহত খেলা।

নতুন শক্তিসমূহের হাতে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসারলাভ পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনাকেই শুধু বাড়িয়ে তুলছে—এ কথাটা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। প্রথমে একমাত্র আমেরিকাই ছিল পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী। তারপর আমেরিকা ও রাশিয়া। এরপরে হোল আমেরিকা, রাশিয়া ও ব্রিটেন। ফ্রান্সও সম্ভবতঃ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে। অনতিবিলম্বে ইসরাইল-এর হাতেও তা এসে পড়বে বলে ধারণা করা যুক্তিহীন নয়। যদি তাই হয় তাহলে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র নিশ্চয়ই তা অনুসরণ করবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কম্যুনিস্ট চীন পারমাণবিক শক্তি অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হবে। যে কোন দু'টো পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন জাতির মধ্যে বিবাদ শুরু হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নীতিতে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়া বিচিত্র নয়।

যখন এ ধরনের দু'টো শক্তির হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকে তখন মাত্র একটি জোড়া হয়। আবার যখন তিনটি পারমাণবিক শক্তি থাকে তখন এমন ধরনের তিনটি জোড়া হয়। চারটি শক্তি হলে হয় ছয়টি, পাঁচটি হলে দশটি; ছয়টি হলে পনেরোটি এবং এভাবে এ সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটবে। শুধু

BanglaBook.org

এ কারণেই হাইড্রোজেন বোমা নতুন শক্তিগুলোর হাতে ছেড়ে দেওয়া বিপজ্জনক নয়। তাছাড়া আরো কারণ রয়েছে। এমনও হতে পারে যে, বিশেষ কোন সরকার নিতান্ত অবিবেচক গোড়ামি কিংবা মাতলামীর বশবর্তী হয়ে বিপদকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। বেশী দিনের কথা নয় যখন একটা বিরাট শক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল একটা মাতালের দ্বারা এবং এমনিতর অবস্থার পুনরাবৃত্তি যে হবে না এমন চিন্তা করা অযৌক্তিক কিংবা অস্বাভাবিক—এর কোনটাই নয়। আরেকবার সিম্যুর সেলম্যান এর উদ্ধৃতি নেয়া যেতে পারেঃ "নিরস্ত্রীকরণের জন্যে তদন্তের কারিগরি-সম্মত সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এর কারণ হোল বহু নতুন জাতির হাতে পারমাণবিক অস্ত্রের বর্তমান অথবা আসন্ন ভবিষ্যতে প্রাপ্তির সম্ভাবনা। এ ভাবে দেখা যাচ্ছে, ছোট কিংবা বড়ো বিভিন্ন বহু সরকারের হাতে মনুষ্যজাতির বিলুপ্তির ক্ষমতা এসে পড়ছে।"

বিস্ফোরণ বন্ধ করার গুরুত্ব রয়েছে দু'টা পরস্পর বিরোধী কারণে। প্রথমটি হোল, সারা বিশ্বে আণবিক তেজস্ক্রিয়তার বিষ পরিব্যাপ্ত হওয়ার কারণ। আর এর প্রভাবে ব্লাড-ক্যান্সার ও ক্যান্সার রোগের উৎপত্তি হয়। তাছাড়া রয়েছে জননেন্দ্রিয়ের মারাত্মক ক্ষতির কথা। এর ফলে জন্ম হয় অথর্ব কদাচার ও বিকলাঙ্গ শিশুর। এগুলো ছাড়াও, বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করার আরো একটি কারণ রয়েছে। যে সমস্ত শক্তিশালী জাতি-সমূহ এখনো পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়নি এদের পক্ষে তা তৈরী করাও সম্ভব নয়। বছরের পর বছর ধরে ব্যাপক আপোষ-আলোচনার বহর দেখে মনে হয়েছিল যে, বিস্ফোরণ পরীক্ষা বন্ধ করার চুক্তি প্রায় আসন্ন কিন্তু ঐ মুহূর্তে ক্রুশ্চেভ-এর 'ট্রয়কা প্রস্তাব' সমস্ত কিছু পাল্টে ফেলে। 'ট্রয়কা' প্রস্তাবের বিষয় ছিল প্রয়োজনীয় তদন্তকার্য পরিচালিত হবে তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে—একজন প্রাচ্যের, একজন পাশ্চাত্যের এবং অপরজন নিরপেক্ষ দেশসমূহের। তাঁর বক্তব্য ছিল যে, ওদের পক্ষে যতক্ষণ অভিন্ন মতে থাকা সম্ভব হবে ততক্ষণই শুধু কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তিনি যে তা-ই ছিলেন তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় নি। তবু তাঁর প্রস্তাব পাশ্চাত্যকে এত বেশী ক্রোধান্বিত করে যে বিস্ফোরণ পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে চুক্তি গ্রহণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পুনরায় বিস্ফোরণ পরীক্ষা শুরু করার ব্যাপারে

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নেবার দরুন সে আশাও প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। আর আমেরিকার ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া অনিবার্যভাবেই ঘটে গেলো।

নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের মতো একটা প্রতিফল প্রায় নিশ্চিত এবং তা সকলেই স্বীকার করতে পারে যে, বিশিষ্ট শক্তিশালী জাতিসমূহের নিষ্ক্রিয়তা ক্রমান্বয়ে পারমাণবিক ধ্বংসলীলার সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তুলছে এবং অদূর ভবিষ্যতে নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে তেমন কোন প্রকার সফলতা আশা করা যায় না।

এখন চলুন বেদনার্ত নিষ্ক্রিয়তার লিপিবদ্ধ ঘটনাসমূহকে বাদ দিয়ে মনুষ্য জাতির অস্তিত্বের জন্যে কি সব করণীয় কর্তব্য রয়েছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করি:

আর এ ব্যাপারে প্রথম কর্তব্যই হোল আণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা বন্ধ করা। এ বিষয়ে আমি পূর্বেই যথেষ্ট আলোচনা করেছি। তার পরের পদক্ষেপই হবে নতুন দেশসমূহে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রসার প্রতিরোধ করা। বর্তমানে পারমাণবিক শক্তিসমূহ সম্মত হলে তা সহজেই সম্পন্ন করা যেতো। ক্ষমতার ভারসাম্যে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া ঘটবে এ রকম মনে করার সঙ্গত কোন কারণ নেই। হাইড্রোজেন বোমা কম্যুনিস্ট চীনের হাতে থাকুক পাশ্চাত্য তা মেনে নিতে রাজী নয় এবং প্রাচ্যেরও এটা পছন্দসই নয় যে, হাইড্রোজেন বোমা ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর হস্তগত হউক। কিন্তু শুধু এক পক্ষের হাতেই তা' চিরকাল থাকবে এমনটি হওয়ারও তো পথ নেই এবং সে জন্যে তাও ঠিক যে উভয় পক্ষই এর প্রসার প্রতিরোধ করে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এর পরের জটিল পদক্ষেপ হচ্ছে পারমাণবিক অস্ত্রসমূহের উৎপাদন বন্ধ করার জন্যে সর্বসম্মত চুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এর জন্যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ তদন্তকারী নীতির প্রয়োজন। এই ধরনের নীতি যে নির্ভরযোগ্য ও ফলপ্রদ তা সহজেই বিশ্বাস করা যেতে পারে। 'Inspection for disarmament' গ্রন্থের আলোচনা অনুযায়ী এই ধরনের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যেতে পারে যা উদ্ধৃতির সাহায্যে আগেই বর্ণনা করেছি। যদিও সেলম্যান-এর গ্রন্থে এ ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত নেই, তবু আমার মনে হয়, তদন্তকারীদের মধ্যে নিরপেক্ষ প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্তি কল্যাণকর হবে। কেননা মতানৈক্য দেখা দিলে নিরপেক্ষ তদন্তকারীর পক্ষে অনুসন্ধানের

BanglaBook.org

ফলাফল সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করা সহজ হবে।

বর্তমানের অস্ত্র মজুদ তদন্ত করার জটিলতা রয়েছে। অস্ত্র মজুদের পরিমাণ গোপন করে রাখা তেমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। কেননা তদন্তের মাধ্যমে গোপনীয়তা ভেদ করা অসম্ভব। আর এ সমস্যাকে কৌশলের সাথে অতিক্রম করা যেতে পারে। প্রতিপক্ষের রাষ্ট্রীয় সীমানায় যদি আণবিক বোমাবর্ষণ করা সম্ভব না হয় তাহলে তা নিছক অর্থহীন এবং আরো অর্থহীন হচ্ছে গোপন করার স্থায়ী ঘাঁটিসমূহ যদি আবিষ্কার করা সম্ভব না হয়। অবশ্য পোলারিশ ক্ষেপণাস্ত্রের অস্থায়ী ঘাঁটিসমূহের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম রয়েছে। কিন্তু ডুবোজাহাজ তৈরীর গোপনীয়তা বজায় রাখা এখন আর সম্ভব নয়। তাছাড়া হাইড্রোজেন বোমা বহনকারী ডুবো জাহাজের অবস্থান খুঁজে বের করা মোটেই কষ্টকর নয়।

এ অবস্থার সংস্কার সাধনের একটা পথ আছে এবং যদি বিভিন্ন জাতিসমূহকে এ ব্যাপারে প্ররোচিত করা যেত তাহলে তা প্রচুর পরিমাণে উপকারে আসতো। আর এ হচ্ছে কোন রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর অবস্থান নিষিদ্ধ করা। আমি আশঙ্কা করছি যে সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা ব্যতীত তা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর মোতায়েন উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থার (NATO) বিবেচনায় প্রয়োজনীয় (অবশ্য কাহ্ন 'On Thermonuclear war' গ্রন্থে তা স্বীকার করেননি) রাশিয়াও মনে করছে যে হাঙ্গেরী ও পূর্ব জার্মানীর জনসাধারণের উপরে দাসত্ব অব্যাহত রাখার জন্যে সেখানে সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখা প্রয়োজনীয়। তথাপি শান্তি অর্জনের দূরবর্তী লক্ষ্যসমূহের অন্যতম এ ব্যবস্থা বাস্তবক্ষেত্রে যখনই সম্ভব হয় আন্তরিকতার সাথেই তা গ্রহণ করার বিষয় বিবেচনা করা উচিত।

ক্রুশ্চেভ-এর সাধারণ এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব পাশ্চাত্যে যেভাবে গৃহীত হয়েছে তা মোটেই যথেষ্ট নয় বরং আরো অধিক গুরুত্বের সাথে তা বিবেচনা করা উচিত। পাশ্চাত্য রাশিয়ার যে কোন প্রস্তাবের প্রতি বরাবর যে ধারণা করে তদ্রূপ এবারও প্রস্তাবের আগেই ধরে নিয়েছে যে, যথোপযুক্ত তদন্তের ব্যাপারে রাশিয়া সম্মত হবে না। ক্রুশ্চেভ ঘোষণা

BanglaBook.org

করেছিলেন যে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পরে তিনি যে কোন পরিমাণ তদন্ত সহ্য করতে রাজী আছেন, কিন্তু তার আগে নয়। নিশ্চয়ই তিনি জানতেন যে, পাশ্চাত্য সে প্রস্তাব মেনে নেবে না। নিরস্ত্রীকরণ মেনে নেয়ার পরে যদি পাশ্চাত্য জানতে পারে যে, প্রাচ্য তা সঠিকভাবে গ্রহণ করেনি, তাহলে তা জেনেও আর কোন লাভ হবে না। কিন্তু ক্রুশ্চেভ আরো বলেছেন যে, যদি বিশ্বব্যাপী সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ নিষ্পন্ন হয় এবং সে ব্যাপারে চুক্তি গ্রহণ করার সাথে সাথেই তিনি যে কোন পরিমাণের তদন্ত মেনে নিতে রাজী আছেন। অথচ প্রস্তাবটি আন্তরিকতার সাথে উত্থাপিত হয়নি এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে পাশ্চাত্য তা প্রত্যাখ্যান করে।

আর এটা একটা মারাত্মক ত্রুটি—পাশ্চাত্য যদি সত্যিই নিরস্ত্রীকরণ কামনা করতো তাহলে এমনটি ঘটতে পারতো না। ক্রুশ্চেভ-এর প্রস্তাব যাচাই করার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ নিজেদের পছন্দমত পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপিত করে। ফলে, উদ্দেশ্যবিহীন যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির লড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্যে জিইয়ে রাখা হয়।

আগামী দশ বছরের মধ্যে আরেকটা বিষয় সবিশেষ গুরুত্ব অর্জন করতে পারে এবং তা হোল মনুষ্য পরিচালিত কৃত্রিম উপগ্রহের পৃথিবীর কক্ষপথে বিচরণের ব্যাপার। ঐ সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিপক্ষের রাষ্ট্রীয় সীমানার উপর দিয়ে মাঝে মাঝে অতিক্রম করবে এবং অত্যন্ত উঁচু থেকে বোমা বর্ষণে সমর্থ হবে। পৃথিবী থেকে বহু উর্ধ্বে অবস্থানের ফলে এগুলোকে আঘাত করা সম্ভব হবে না। অথচ এদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধন করার ক্ষমতা থাকবে।

এ কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ঐ ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা যদি সম্ভবপর না হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতেই মহাশূন্য ঐ ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং এদের নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চলতে থাকবে মৃত্যু ও ধ্বংসের খেলা। এমন অবস্থাকে প্রতিরোধ করার এখনো সময় আছে। আর এজন্যে এমন একটা চুক্তি গ্রহণ করা উচিত যার মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথে কিংবা এর চেয়েও দূরবর্তী অঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে এবং তা বিশেষ কোন একটি জাতি কিংবা বিশেষ কোন গোষ্ঠীভুক্ত জাতিসমূহের নিয়ন্ত্রণে থাকবে না। বর্তমানের অসুবিধা হোল যে, রাশিয়া

BanglaBook.org

যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এ ব্যাপারে বিচক্ষণতার অধিকারী এবং সেজন্যে রাশিয়ার আত্মবিশ্বাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিক্ষত চেতনা পারস্পরিক সমঝোতার ব্যাপারে সৃষ্টি করেছে এক বিরাট অন্তরায়। আমরা আশা করছি, অল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া এ ব্যাপারে সমতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। রাশিয়ার বর্তমান প্রাধান্যতা হচ্ছে বেদনার্ত ব্যাপার এবং তা রাশিয়ান বলে নয়—বরং চুক্তি নির্ধারণের প্রতিবন্ধকতা বলেই। যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও যদি এমন হোত তাহলেও এর ব্যতিক্রম হোত না।

বর্তমান শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে শুধু কৃত্রিম উপগ্রহের অস্তিত্বের সম্ভাবনাই শেষ কথা নয়। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষ অবতরণ করবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে মঙ্গল থেকে শুক্র গ্রহেও মানুষ পৌঁছে যাবে। অনেকের কাছে তা নিতান্ত অসাড় বিষয়; কিন্তু আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সম্ভবতঃ রাশিয়ার ক্ষেত্রেও তাই সত্য। জনৈক প্রখ্যাত সামরিক বিশেষজ্ঞকে 'লেং জেং ডুনাল্ড এল্ পল্ট—"যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর সহকারী প্রধান রাশিয়ানদের সর্বপ্রথম চাঁদে অবতরণের সম্ভাবনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তিনি স্পষ্ট যুক্তির মাধ্যমে বলেছেন যে, তা এমন কোন সমস্যার কথা নয়, কেননা যুক্তরাষ্ট্র মঙ্গল ও শুক্রে অবতরণের প্রচেষ্টায় রাশিয়াকে মোকাবেলা করবে। আমার মনে হয়, অদূর ভবিষ্যতে এ ধরনের সম্ভাবনা অসম্ভব নয়। ১৯৪৫ সনের আগে আমাদের পৃথিবীতে তা হয়ত একটা ভয়াবহ ব্যাপার বলে মনে করা হোত; কিন্তু ষোল বছরের সময়ে এ বিষয়টা আমাদের কাছে সহনীয় হয়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ এর পরবর্তী ষোল বছরে যদি আমরা তখনও বেঁচে থাকি, তখন ১৯৬১ সনের পৃথিবীর অবস্থা তুলনামূলকভাবে স্বর্গের সহজ জীবন পদ্ধতির সমতুল্য হবে।

অতএব আয়োজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? আমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, রাশিয়ান খাদ্য সরবরাহের প্রতিনিধি ও আমেরিকান নৌ-সৈন্যরা পারস্পরিক শত্রুতার সূত্র ধরে চন্দ্রপৃষ্ঠেও একে অপরকে খুঁজে বেড়াবে এবং সে অবস্থায় নিজেদেরকে মাত্র কয়েকদিন জীবিত রাখার জন্যে প্রয়োজন হবে বিপুল পরিমাণ অর্থের। আর সন্ধান পাওয়া মাত্র একে অপরকে করবে ধ্বংস। প্রতিপক্ষই অপর পক্ষের ধ্বংসের কথা জানতে পেরে নিজেদের বিজয়কে উদযাপিত করবে দেশব্যাপী

BanglaBook.org

সাধারণ ছুটির দিন ঘোষণার মাধ্যমে। এটাই হচ্ছে মহাজাগতিক হাস্যকর কার্যক্রমের বিয়োগান্ত অধ্যায়। আর এই পথেই আমাদিগকে পরিচালিত করছেন বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কেরা। হয়তো তা কেবলি সম্ভাবনার ব্যাপারে এবং এমন যে ঘটবে তা'ও নিশ্চিত করে বলা যায় না—যে কল্পনার রথে আমাদের বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে তাদের বিচরণ চিরকাল চলবে। সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি কিংবা মানবতার ছিটে ফোঁটা তাদের মনে হয়ত কোনদিন স্থান পেতে পারে এবং এ বিষয়ে এদের মতৈক্য হতে পারে যে আমাদের নিজেদের কলহ ধরণীর সর্বত্র এবং বিভিন্ন শান্তিপূর্ণ গ্রহের এবং সেখানে যে কোন ধরনেরই জীবিত প্রাণী থাকুক না কেন তা যেন তাদের মধ্যে আমাদের ভুল ও নষ্টামি সম্প্রসারিত করে না দেয়।

এই নিরানন্দ অধ্যায়ের উপসংহারে বলা যায়ঃ ঘৃণা, সময়, অর্থ ও বিচক্ষণতা মারণাস্ত্র আবিষ্কারের জন্যে অপচয় হচ্ছে। পারস্পরিক ভীতি প্রদর্শনের কী পরিণাম হতে পারে এ বিষয়েও আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তদুপরি রয়েছে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে মানব-সভ্যতার বিলুপ্তির সমূহ সম্ভাবনার কথা। আর এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের পুরোপুরিভাবে জ্ঞাত থাকা বাঞ্ছনীয়। আমি বলতে চাই যে, এসব কিছুর মূলে রয়েছে আমাদের নির্বুদ্ধিতা। আর তা নিয়তির বিধান নয়। কিংবা নয় কোন প্রাকৃতিক ব্যতিক্রম। এ শয়তানীর উৎস হচ্ছে মানুষেরই নিজেদের মন। তাছাড়া আদিম নিষ্ঠুরতা, কুসংস্কার এবং বোধ করি, পুরাকালের অসভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত প্রবৃত্তির তাড়না রয়েছে এর মূলে। আর আমাদের যুগে যা রয়েছে এর মূলে তা হচ্ছে প্রথমতঃ নিজেদের সুখ-শান্তি ধ্বংস এবং পরবর্তী পর্যায়ে জীবন ধ্বংস করার পুরো-পুরি সম্ভাবনা। নরকের এ বিভীষিকাকে স্বর্গে রূপান্তরিত করতে হলে একটা জিনিসের প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সমভাবে পারস্পরিক ঘৃণা ও ভয় বর্জন এবং তাদের এ বিষয়টা অনুধাবন করতে হবে যে, স্বেচ্ছায় মিলেমিশে কাজ করতে পারলে সকলের জন্যেই তা হবে কল্যাণকর। আমাদের হৃদয়ই হচ্ছে যতসব কুকর্মের ক্ষেত্র আর তাকে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে হৃদয় থেকেই।

BanglaBook.org

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রাখার সমস্যাসমূহ

রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার ব্যাপারে কতকগুলো প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো শান্তি অর্জন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধানের আগে স্থির করা প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে প্রধান হোল ফরমোজা, কোরিয়া এবং লাউস। উভয়ের পক্ষেই গ্রহণযোগ্য কোন নীতি নির্ধারণ খুব সহজসাধ্য নয়। পাশ্চাত্য আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার মেনে নেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, ঐ নীতি শুধু সোভিয়েত প্রভাবান্বিত অঞ্চলেই নিয়োজিত করার ব্যাপারে পাশ্চাত্য ইচ্ছুকও রয়েছে। অথচ স্পেন ও পর্তু-গালের বেলায় গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মেনে নেয়ার জন্যে পাশ্চাত্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণে অনিচ্ছুক। পশ্চিম গোলার্ধের কম্যুনিস্ট সমর্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশে আলোচ্য নীতি মেনে নেয়া হবে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐ ধরনের প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করা হবে কিনা এ বিষয়ে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। খুব জোরের সাথে যে বিষয়টা বলা যেতে পারে তা হোল যে সমস্যাসমূহের আপোষ-আলো-চনার মাধ্যমে মীমাংসা হওয়া উচিত। 'ব্রিকম্যান-শিপ'-এর পদ্ধতিতে পরস্পরকে ভীতি প্রদর্শন করে কোন ফল হবে না। বরং আপোষ আলো-চনায় যোগদানের জন্যে নিরপেক্ষ জাতিসমূহকে নিমন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

রাশিয়ান বিপ্লবের পরে 'রিপভ্যান উইনকেল' জাতীয় নীতি পরি-চালনার জন্যে পাশ্চাত্যকে দোষী করা হয়ে থাকে। বহু দিন যাবত পাশ্চাত্য সোভিয়েত সরকারকে স্বীকৃতি দান করেনি। আজো আমেরিকা ও জাতি-সংঘ চীনের কম্যুনিস্ট সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। পাশ্চাত্য পূর্ব জার্মান সরকারকে কিংবা 'ওডারনিসি' সীমান্তের নিশ্চিত বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে। পরের ঘটনাটির ব্যাপারে পশ্চিম জার্মান সরকার এবং ব্যক্তিবিশেষে

BanglaBook.org

বহু সংখ্যক জার্মান দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তা পুনর্বিবেচনার কোন সম্ভাবনাই নেই। একমাত্র যুদ্ধে পরাজিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন প্রকার অবস্থায় কম্যুনিস্ট শিবির তা মেনে নিতে পারে না। কিন্তু সে ধরনের পরাজয় কেবল পারমাণবিক যুদ্ধের ফলেই সম্ভবপর হবে এবং পাশ্চাত্যও যখন একই সমানে পরাস্ত হবে। শুধু তাই নয়, খুব সম্ভব সমস্ত সুশৃঙ্খল সরকারই তখন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ জার্মানীর পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার পরিবর্তিত ব্যবস্থায় মারাত্মক ও ব্যাপকতর নিষ্ঠুরতার পুনরাবৃত্তি ঘটবে যা রাশিয়ান ও পোলিশ অধিবাসীরা জার্মান জনসংখ্যাকে এখন আর আইনতঃ জার্মানীর নয় এমন সব অঞ্চল থেকে বিতারিত করার জন্যে সংঘটিত করেছিল।

বর্তমানে প্রচলিত এমন ধরনের কোন রাজত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ সম্মতি দেওয়া বুঝায় না। এটা মনে করতে হবে যে, শুধু চলতি বিষয়বস্তুকে স্বীকার করা হয়েছে। পাশ্চাত্য পরিশেষে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকেই স্বীকার করেছে; কিন্তু এ অভিজ্ঞতা থেকে এ শিক্ষা লাভ করেনি যে, তার স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতা বিজ্ঞজনোচিত হয়নি, কেননা সে শাসনপ্রণালী বিনষ্ট করা মহাযুদ্ধ ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়।

বর্তমান কালের সবচেয়ে কষ্টকর ও বিপজ্জনক রাষ্ট্রীয় সমস্যা হোল জার্মানী ও বার্লিনকে কেন্দ্র করে। আর এ প্রশ্নের জটিলতা এত বেশী সংকটময়, যে কোন মতামত ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার আগেই তা পুরনো হয়ে পড়বে। তথাপি কি করা দরকার বা কি করা উচিত নয়, এ বিষয়ে কিছু একটা বলতে হবে। সাবর বিমানের শোঁ শোঁ শব্দের মাধ্যমে দু'পক্ষের কারো এ সমস্যার মোকাবেলা করা উচিত হবে না। অথচ দুর্ভাগ্যক্রমে তাই-ই হচ্ছে। উদাহরণ নেয়া যেতে পারে ১৯৬১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বহরের সর্বাধিনায়ক এডমিরাল বার্ক বলেছিলেনঃ "সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষমতার অধিকারী থাকবো ততক্ষণ, আমার ব্যক্তিগত ধারণা, মহাযুদ্ধ সংঘটিত হতে পারবে না। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন যা-ই করুক, তাতে কিছুই যায়-আসে না। বর্তমানে আমাদের সে সামর্থ আছে" (দি টাইমস্ ফেব্রুয়ারী ১৭, ১৯৬১)। মিঃ ক্রুশ্চেভ ১৯৬১ সনের

BanglaBook.org

৯ই জুলাই প্রায় একই ধরনের বিবৃতি দান করেছিলেন----"কোন আক্রমণকারী যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা এর বন্ধু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায় তাহলে তাকে সমুচিত আঘাত পেতে হবে। সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর হাতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ আণবিক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। নিকটবর্তী ও মাঝারিপাল্লার লক্ষ্যস্থল আক্রমণে সক্ষম রকেট রয়েছে। আরো রয়েছে আন্তঃমহাদেশীয় পাল্লার রকেটসমূহ। যারা যুদ্ধের স্বপ্ন দেখছে এদের মনে রাখা উচিত যে শুধু দূরত্বের খাতিরেই এরা রেহাই পাবে না। এমনকি সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধ শুরু করলেই রেহাই পাবে না--সাম্রাজ্যবাদের সাথে সাথে এরাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানবজাতি চূড়ান্তভাবে সমাপ্ত করে দেবে এমন সব ব্যবস্থা যা লুণ্ঠনকারী সংগ্রামের জন্ম দেয়" (দি টাইমস, ১০ই জুলাই, ১৯৬১)। আমি এডমিরাল বার্ক এবং ক্রুশ্চেভ-এর সাথে একমত যে, উভয় পক্ষই প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার ব্যাপারে ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু উভয় মানবহিতৈষীদেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, দুষমনেরাও তাদের পক্ষ ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে। এমন ধরনের পারস্পরিক ভীতি প্রদর্শন মীমাংসার ব্যাপারে কোন কাজেই আসে না। এর ফলে শুধু লড়াইকেই অনিবার্য করে তোলা হয়। ঠিক এ মুহূর্তে যা আলোচনার দরকার তা হচ্ছে বার্লিন সমস্যা। একথা সকল দলেরই জানা উচিত যে, যুদ্ধের ফলে পশ্চিম বার্লিরেন সমস্ত অধিবাসীরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এমন ধরনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে তাদেরকে রক্ষা করার যথাযোগ্য ব্যবস্থা উপরোক্ত উপায়ে সম্ভবপর নয়।

পশ্চিম বার্লিনের প্রশ্নে ঘোরতর জটিলতা রয়েছে। এ কারণে ভালো-মন্দ দু'দিকেরই পর্যালোচনা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের জার্মান বিরোধী মিত্রপক্ষীয় নীতির ফলে মহাসমরের পরিসমাপ্তি কোন প্রকার শান্তির চুক্তিতে সম্পন্ন হয়নি। চুক্তি ছিল শুধু একটাই এবং তা ছিল বিজয়ীরা কিভাবে জার্মানীকে শাসন করবে। জার্মানী বিভক্ত হোল চারটি অঞ্চলে—আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফরাসী ও রাশিয়ান এবং যার অংশে যতখানি আছে ততখানি সে শাসন করবে। বার্লিন পুরোপুরি রাশিয়ান এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এক্ষণে তা'ও চারটি অংশে বিভক্ত হয়ে গেলো এবং প্রতিটি অংশের শাসক শক্তি হোল অসীম ক্ষমতার মালিক। কিন্তু একটা ভুল থেকে গেলো প্রায় অবিশ্বাস্যভাবেই।

BanglaBook.org

পাশ্চাত্য নিজেদের এলাকা থেকে রাশিয়ান অধিকৃত অঞ্চলে চলাচলের কিংবা গমনাগমনের কোন শর্ত রাখেনি। আর রাশিয়া এর সুযোগ গ্রহণ করে ১৯৪৮ সনে অবরোধ ব্যবস্থার ঘোষণার মাধ্যমে। বেসামরিক অধিবাসীদের বিমানে অপসারণ পদ্ধতি প্রমাণ করে দিল অবরোধ ব্যবস্থার অস্বার্থকতা। তখন রাশিয়া পশ্চিম বার্লিনে আগমন ও বহির্গমনের স্বাধীনতার চুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাজী হয়। জার্মানীতে পাশ্চাত্যের তিনটি এলাকা ইতিমধ্যে সংঘবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্যে সরকার গঠনের আদেশ দিতে সম্মত হোল। বার্লিনে পাশ্চাত্যের তিনটি এলাকারও ঐ ধরনের ব্যবস্থা গৃহীত হোল। জার্মানী ও বার্লিনের ব্যাপারে সমস্ত আপোস-মীমাংসার আইনসম্মত বৈধতা নির্ভর করত ইয়ালটা ও পটসড্যাম-এ গৃহীত চুক্তির উপরে। ঐসব ঐকমত্য জার্মানীর সাথে সরাসরি চুক্তি হওয়ার সাপেক্ষে নির্ধারিত হয়েছিল। জার্মানী পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বিভক্ত হওয়ার দরুন আজ অবধি ঐ ধরনের চুক্তি অসম্ভবই রয়ে গেলো। এক্ষণে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করেছেন যে, রাশিয়া ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যুদ্ধকালীন ঐকমত্য পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্যে পূর্ব জার্মানীর সাথে একটা চুক্তি সম্পন্ন করা হবে এবং এর ফলে পশ্চিম বার্লিনের আইনানুগ মর্যাদার বিলোপ সাধন হবে এবং যতক্ষণ পূর্ব জার্মানী পাশ্চাত্যের সাথে নতুন কোন চুক্তিতে আবদ্ধ না হয় ততক্ষণ তা বলবৎ থাকবে। পাশ্চাত্য মনে করে, পূর্ব জার্মানী এমন কোন চুক্তি নিষ্পন্ন করবে তা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সোভিয়েত সরকারও ঘোষণা করেছেন যে, আলোচ্য চুক্তি সমাধানের ব্যাপারে পূর্ব জার্মানীকে কোন প্রকার চাপ দেওয়া হবে না।

সংক্ষেপে সমস্ত সমস্যাটির মর্মবাণী বুঝতে হলে তা এভাবে বুঝতে হবে যে, পশ্চিম বার্লিন ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে অবাধ চলাচল ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে পশ্চিম বার্লিন পুরোপুরিভাবে পূর্ব জার্মানীর কৃপার উপরে নির্ভরশীল হবে। যেহেতু পূর্ব জার্মানী সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সে জন্যে এর অর্থ হবে এই যে, পশ্চিম বার্লিন এর অস্তিত্বের জন্যে বিনা প্রশ্নে সোভিয়েত সরকারের যে কোন শর্তকে মেনে নিতে হবে। আইনের দিক থেকে পাশ্চাত্যের ব্যবস্থা নিরাপদ। পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অধিকার প্রশ্নটি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি

BanglaBook.org

নিষ্পন্ন করার উপরে নির্ভরশীল। আর ন্যায়তঃ বিশেষ কোন পক্ষ তা নাকচ করতে পারে না এবং এটা চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সামগ্রিক-ভাবে জার্মানীর সাথে কিংবা এর দু' অংশের যে কোন একটির সাথে সাধারণ শান্তি চুক্তি সম্পাদন না করা হয়। ঐ ধরনের একটা চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্যে ক্রুশ্চেভ দাবি তুলেছেন—অথচ এর সাথে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যদি পাশ্চাত্য এর বিরুদ্ধে কোন প্রকার জেদ ধরে তাহলে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নিজেই পূর্ব জার্মানীর সাথে একটা চুক্তি সম্পাদন করে ফেলবে। যার ফলে বিবেচনা করা হবে যে, পশ্চিম বার্লিন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের অধিকারসমূহের সমাপ্তি ঘটেছে। এ ধরনের মতামত আইনের যুক্তিতে গ্রাহ্য নয়।

নৈতিকতার দিক্ থেকে ক্রুশ্চেভ পারমাণবিক যুদ্ধকে পরিহার করার অনিবার্য নিয়ম—যা উভয় পক্ষের কাছে অবশ্যই স্বীকৃত—তা লংঘন করে-ছেন। কেননা তিনি যুদ্ধের ভীতি দেখিয়ে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করার কথা বলেছেন যা' অপরিমিত মাত্রায় শুধু পূর্ব জার্মানীর জন্যে সুবিধাজনক হবে এবং পক্ষান্তরে পশ্চিম জার্মানীর অপরিসীম অসুবিধার কারণ হবে। এ বিষয়টা যদি মেনে নেয়া হোত যে, পারমাণবিক সংঘাত উভয় অংশের জন্যেই মারাত্মক পরিণতি টেনে আনবে, তাহলে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধন অবশ্যই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সম্ভবপর। আর এক্ষেত্রে শক্তিমত্তার ভয় দেখানো মোটেই বাঞ্ছিত নয়। তাছাড়া, ক্ষমতার ভারসাম্যে ভীষণভাবে যেন পরিবর্তন না হয় তা'ও দেখতে হবে। কেননা যদি এমনটি ঘটে তাহলে তা মেনে নেয়া যাবে না। হয়তো যুক্তি দেখানো হবে, এক পক্ষ যদি ভীতি প্রদর্শন করে এবং যেহেতু এর চরম অবস্থায় পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা রয়েছে, সে জন্যে অপর পক্ষের ভীতি স্বীকার করা উচিত। কিন্তু ন্যায় হোক কিংবা অন্যায় হোক, এমন ধরনের আচরণ কোন জাতিই করবে না। জাতীয়মর্যাদাবোধের সাথে জড়িত রয়েছে এমন একটা বিশ্বাস প্রত্যেকের নিজের দাবির যৌক্তিকতা রয়েছে এবং অনিবার্যভাবেই ভীতি প্রদর্শনের মোকাবেলা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমেই করা হবে। আর এর ফলেই 'থ্রিংকম্যানশীপ' নীতি এতটা বিপজ্জনক। বর্তমান মুহূর্তে উভয়পক্ষই এ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে এবং বার্লিন প্রশ্নে এই ভয়াবহ

BanglaBook.org

বিপজ্জনক পরিস্থিতির জন্যে প্রধানতঃ রাশিয়াকেই দায়ী করা হয়।

পশ্চিম বার্লিনের অধিবাসীদের জীবন বেদনার্ত করার পেছনে রাশিয়ার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য কী তা খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা সুস্পষ্ট। পূর্ব জার্মান এবং পূর্ব বার্লিন দারিদ্র্য-নিপীড়িত এবং জনসংখ্যার প্রধান অংশই তাদের সরকারসমূহের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিম বার্লিন উন্নত ও সম্পদশালী এবং তাদের সরকার-সমূহও জনপ্রিয়। পূর্ব জার্মানীর বহু সংখ্যক অধিবাসী পশ্চিমে পালিয়ে এসেছিল। তা সম্ভব ছিল যতক্ষণ পশ্চিম বার্লিন ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল এবং পশ্চিম বার্লিন পূর্ব জার্মানীর নিকট ছিল অবারিত। কম্যুনিস্ট জগতের জন্যে তা নিতান্তই লজ্জাকর। কম্যু-নিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে এ অবস্থার সুরাহা হোল পশ্চিম বার্লিনকে পূর্ব বার্লিনের মতো দারিদ্র্য-নিপীড়িত ও দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ করে তোলা এবং পশ্চিম বার্লিন থেকে পশ্চিম জার্মানীতে পালিয়ে আসার পথ বন্ধ করে দেওয়া। আর এমন ধরনের কোন ব্যবস্থা কোন মানবহিতৈষীর পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

অবশ্য তা'ও বলা সঙ্গত হবে না যে, পাশ্চাত্য বার্লিন সঙ্কটকালে যথেষ্ট বিজ্ঞতার সাথে কাজ করেছে। যদি পশ্চিম বার্লিনের মর্যাদার নিশ্চয়তা বিধান সম্ভবপর হয়ে থাকে—পাশ্চাত্যের পূর্ব জার্মান সর-কারকে স্বীকৃতি না দেওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি থাকতে পারে না। পাশ্চাত্যের এ সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে, যার ফলে জানা যাবে পূর্ব জার্মান সরকার পশ্চিম বার্লিনের মর্যাদা সংরক্ষণের বিষয়েও পূর্ব জার্মান সরকারকে পাশ্চাত্য কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া হলে বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করার স্বাধীনতা মেনে নেয়ার ব্যাপারে ইচ্ছুক কিনা। আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্য পূর্ব জার্মান সরকারের এ বিষয়ে কী উদ্দেশ্য রয়েছে তা অবগত হতে সমর্থ হয়নি। যদি পশ্চিম বার্লিনের বর্ত-মান মর্যাদা সংরক্ষণ করা সম্ভবপর হয় তাহলে সঙ্কট বৃদ্ধি ও সর্বাত্মক যুদ্ধের ঝুঁকি গ্রহণের কোন অর্থই নেই। অনতিবিলম্বে পাশ্চাত্যের এ বিষয়ে অবগত হওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, পূর্ব জার্মানী—আমাদের দিক থেকে স্বীকৃতি ও অপর পক্ষের—পশ্চিম বার্লিনের মর্যাদায় পরিবর্তন সাধন না করার নিশ্চয়তা দান, সত্যিই চায় কিনা। সম্পূর্ণ বার্লিনকে 'মুক্ত নগরী' করে তোলার কথাবার্তা শোনা যায়। কিন্তু এটা কখনো

BanglaBook.org

পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। তার ফলে পশ্চিম জার্মানীর সাথে অবাধ চলাচলের পথ উন্মুক্ত হবে কিনা। আর তাই যদি হয়, প্রস্তাবটা বিবেচনা করার অবকাশ রাখে।

অবাধ যাতায়াতের ব্যাপারে পশ্চিম বার্লিনের টেম্পল হফ্-এ বর্তমান বিমান বন্দর অব্যাহত রাখতে হবে। কিন্তু এটা পরিত্যাগ করার জন্যে পূর্ব জার্মানীর একটা অশুভ ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর টমপলহফ্-এর বিমান বন্দরের জন্যেই পশ্চিম বার্লিন অবরোধ সমস্যাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল।

পশ্চিম জার্মানীর মতে, পশ্চিম বার্লিনে স্থানীয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না থাকাই যত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সমস্ত এলাকাটাই চতুর্দিকে রাশিয়ান সৈন্যদের কাছে উন্মুক্ত এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্যে সর্বাত্মক পারমাণবিক যুদ্ধ ছাড়া আর কোন পথ নেই। এমন ধরনের যুদ্ধে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের উভয় অংশের অধিবাসীরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এটাই হবে তথাকথিত অদ্ভুত ধরনের রক্ষা ব্যবস্থার প্রতিফল। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, বাস্তবিক পক্ষে শুধু পারমাণবিক যুদ্ধের ভীতি প্রদর্শনের মধ্যেই সীমিত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত রাশিয়াও একই রকম ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত রাখবে। ভীতি প্রদর্শন যদি নিছক ধাপ্পার ব্যাপারই হয় তাহলে রক্ষে পাওয়ার ব্যবস্থা উদ্ভাবনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি তা ধাপ্পাবাজী মনে করা হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে তা না হয়, তাহলে মনুষ্য জাতির অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে।

সম্ভবতঃ পশ্চিম জার্মানী বার্লিন প্রশ্নের ব্যাপারে গালিসির জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং সমস্ত অকম্যুনিস্ট পৃথিবী সমবেত করে তথাকথিত শান্তিপ্রিয় জাতিসমূহের ভীতি প্রদর্শনের বিরোধিতা করে আসল চেহারার উন্মোচন করে দেবে। মিঃ ডীন রাস্ক্ সম্প্রতি প্রায় একই ধরনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু উভয়পক্ষের কেউ তা মেনে নেবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।

শুধু বার্লিন নয় বরং জার্মানীর সমস্ত মর্যাদার প্রশ্ন স্থায়ী শান্তিপথকে বিঘ্নিত করেছে। প্রায় প্রতিটি জার্মানই স্বাভাবিকভাবে যুক্ত জার্মানীর পূর্বাবস্থা কামনা করে। জার্মানীর একটি অংশ কম্যুনিস্ট, আরেকটি অকম্যুনিস্ট থাকা অবস্থায় তা সহজে সম্ভব নয়। লক্ষ্য করার বিষয় যে,

BanglaBook.org

সম্প্রতি ক্রুশ্চেভ 'রাপাকী' পরিকল্পনাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা জার্মানী এবং এর পূর্বে অবস্থিত কয়েকটি দেশ নিরপেক্ষ ও নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে; আর এদের রক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে রাশিয়া ও পাশ্চাত্যকে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। বিশ্বশান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে তা নিঃসন্দেহে একটা প্রশংসনীয় পরামর্শ এবং পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ তা মেনে নিলে অত্যন্ত সুখের ব্যাপার হোত। কিন্তু আমি আশংকা করছি—এ বিষয়ে অত্যন্ত ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে। এডেন্যুর প্রবলভাবে এর বিরোধিতা করেছেন, কেননা তিনি একটা শক্তিশালী জার্মানীর সপক্ষে। আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্সও এর বিরোধিতা করেছে, কেননা রাশিয়াকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারে এরা জার্মানীর সশস্ত্র সাহায্যে কামনা করেন। পাশ্চাত্যের কেউ এ বিষয়টা লক্ষ্য করেননি যে 'রাপাকী' পরিকল্পনা কতেক সংখ্যক কম্যুনিস্ট দেশেরও নিরস্ত্রীকরণ সাধিত করবে এবং এর ফলে পশ্চিম জার্মানীর নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে ভারসাম্য বজায় থাকবে।

পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের পশ্চিম জার্মানীর উপরে নির্ভরশীলতার কতকগুলো বিপজ্জনক দিক রয়েছে যা সবিশেষ যত্নসহকারে অবজ্ঞা করা হয়েছে। জার্মান সৈন্য বাহিনীর সেনা নায়কদের মধ্যে বহু প্রাক্তন নাৎসী রয়েছেন। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মান বাহিনীর পুনরুজ্জীবনের নজির নেয়া যেতে পারে।

বৃটিশ সরকারের আমন্ত্রণে বৃটেনে জার্মান সেনাবাহিনী মোতায়েন রয়েছে। ১৯৪০ সনের অভিজ্ঞতা এত দ্রুত আমরা বিস্মৃত হয়েছি—বড়ই তাজ্জবের ব্যাপার।

এ সমস্ত জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান অধিকতরভাবে সহজতর হোত যদি ক্রুশ্চেভ-এর সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব মেনে নেয়া হোত। বর্তমান সংকটের সর্বক্ষণ ক্রুশ্চেভ বার বার সে প্রস্তাব উল্লেখ করেছেন। জার্মানরা মনে করেন যে, "রাপাকী" পরিকল্পনায় কেবলমাত্র জার্মানকেই নিরস্ত্রীকরণ করা হবে এবং অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গ এর আওতা থেকে বাদ যাবে। নিরস্ত্রীকরণ যদি সাধারণ পর্যায়ে হোত তা হলে এ আপত্তির কোন জোর থাকতো না।

বার্লিন ও জার্মান সমস্যায় বৃহৎ শক্তিগুলোর কোনটাই এ পর্যন্ত সফলতা

BanglaBook.org

কিংবা বিজ্ঞজনোচিত কূটনীতিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র পরিচয় দেয়নি। সম্ভবতঃ পারমাণবিক সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে গেলে উভয়পক্ষই অস্পষ্টতর নীতি বিসর্জন দিয়ে নিজেদের জনসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। নিজেদের জাতীয়তাবাদী অহংকার ও অনমনীয়তার জন্যে যতক্ষণ পারস্পরিক দোষ-ত্রুটির ফলশ্রুতিস্বরূপ উভয়েরই নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশংকা থাকে, ততক্ষণ ভীতি প্রদর্শনের কাছে দু'পক্ষের কেহই নতি স্বীকার করবে না।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একাদশ অধ্যায়

নিরাপদ পৃথিবীর উপরেখা

একটা নিরানন্দ মুহূর্তে আমি এখন লিখছি (জুলাই, ১৯৬১) এবং এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই, আমি যা লিখছি তা প্রকাশ করার সময় পর্যন্ত মনুষ্য জাতি বেঁচে থাকবে কিনা অথবা প্রকাশিত হলেও পড়া হবে কিনা। কিন্তু তবু আশাবাদী হওয়া সম্ভবপর। আর তা যদি সম্ভবপরই হয় তা হলে নিরাশ হওয়া শুধু কাপুরুষেরই লক্ষণ।

বর্তমানে বিশ্বের সামনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হোল : যুদ্ধের মাধ্যমে এমন কিছু কি অর্জন করা সম্ভব যা কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? কেনেডী ও ক্রুশ্চেভ বলেন—'হ্যা' সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ বলেন—'না'। এ বিরাট প্রশ্নে কেনেডী ও ক্রুশ্চেভ-এর মতদ্বৈধতা নেই। যদি কেউ উভয়ের সম্ভাব্য ঘটনা সম্বন্ধে ধারণার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে পারেন তা হলে বুঝতে পারবেন যে এঁদের মতে মানুষের নিশ্চিহ্ন হওয়ার সময় এসে গিয়েছে। অবশ্য উভয়েরই যে এরূপ ধারণা রয়েছে তা বলা যায় না। অহংকার, অসৌজন্য, চোখলজ্জার ভয় এবং আদর্শগত অসহিষ্ণুতা তাঁদের বিচার ক্ষমতাকে ম্লান করে দিয়েছে। তাঁদের নিজেদের অন্ধত্ব শক্তিশালী চাপ প্রয়োগকারী চক্রের সমজাতীয় অন্ধত্বের দ্বারা জোরদার হয়েছে। তদুপরি রয়েছে তাদের নিজেদের অপপ্রচারের দরুন উদ্বুদ্ধ অযৌক্তিক মাতলামি। আরো রয়েছে সহকর্মী ও অধীনস্থদের এ ব্যাপারে সহকারিতা।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে শক্তিশালী চক্রের বিপজ্জনক কারসাজি প্রতিরোধ করার জন্যে কি করা যেতে পারে?

হয়তো কোন নিরাশাবাদী যুক্তি দেখতে পারেন? মনুষ্যজাতির সংরক্ষণের জন্যে এতসব আয়োজনের কি প্রয়োজন? অপরিসীম বেদনার, ঘৃণার এবং ভীতির বোঝা এতদিন যা মানুষের জীবনকে বিষিয়ে দিয়েছে

BanglaBook.org

তা থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা কি আমাদের বরং উৎফুল্ল হওয়া উচিত নয়। আমাদের পৃথিবী গ্রহের নতুন ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনায় আমাদের কি সুখী হয়ে চিন্তা করা উচিত নয়। দীর্ঘদিন বেদনার ও বিভীষিকা কালো রাত্রি শেষে নীরবে ঘুমাবার সম্ভাবনায় কি আমাদের স্ফূর্তি করা সঙ্গত নয়?

অপরাধ, নিষ্ঠুরতা ও দুঃখ-দুর্দশার ভয়াবহ ইতিহাস---যা জুড়ে আছে মানুষের জীবনব্যাপী, সে সম্বন্ধে সচেতন যে কোন ছাত্রের কাছে মুহূর্তের বিদগ্ধ কল্পনায় এ সমস্ত প্রশ্ন মনে আসা একান্ত স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ আমাদের পর্যালোচনা আমাদেরকে আনন্দে সক্ষম মনুষ্যরূপী প্রাণীদের একটা পরিসমাপ্তি মেনে নেয়ার জন্যে প্রলুব্ধ করতে পারে এবং তা যতই মর্মান্তিক ও চূড়ান্ত হোক না কেন।

কিন্তু নিরাশাবাদী শুধু অর্ধসত্যকেই জানলেন এবং আমার মতে, তুলনামূলকভাবে কম প্রয়োজনীয় অর্ধেক সত্যকেই তিনি আঁকড়ে ধরেছেন। মানুষের শুধু পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট নিষ্ঠুরতা ও যাতনার ক্ষমতাই নেই—তার মহত্ব ও দীপ্তির প্রচ্ছন্ন শক্তিও রয়েছে। হতে পারে আজ অবধি শুধু অত্যন্ত আংশিকভাবেই তা প্রকাশিত কিন্তু সুখী ও মুক্ত পৃথিবীর সাহচর্যে জীবন কী হতে পারতো এর মধ্যে রয়েছে তার ইঙ্গিত। মানুষ যদি নিজেকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারতো তা হলে এমন কিছু অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভব হোত যা বর্তমানে আমাদের কল্পনারও বাইরে। দারিদ্র্য, ব্যাধি, নিঃসঙ্গতা হতে পারতো একান্তভাবে অনুপস্থিত। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা ভয়ের রাত্রিকে বিদূরিত করতে সক্ষম হোত যা অসুস্থ মানসিকতার জন্যে আমরা বহুল পরিমাণে হারিয়েছি এবং ক্রম অগ্রগতির বিবর্তনে যা আজ শুধু বিশেষ কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির দীপ্ত প্রতিভা তা অনেকেরই অধিকারে থাকতে পারতো। এসব কিছুই সম্ভব এবং সঙ্গত কারণেই, আমাদের সামনের হাজারো শতাব্দীর যদি আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থল পৌঁছুবার পরিপক্কতা অর্জনের আগেই দ্বিধাহীন উন্মত্ততায় নিজেদের ধ্বংস করে না ফেলি। না, নিরাশাবাদীদের কথা আমরা শুনবো না। কেননা, যদি আমরা শুনি, তাহলে মানুষের ভবিষ্যতকে বিঘ্নিত করার অপরাধে আমরা আগামীকালের কাছে বিশ্বাসঘাতক রূপে পরিগণিত হোব।

BanglaBook.org

ঐ সময় দূরবর্তী আশার কথা বাদ দিয়ে বর্তমান যুগে আমাদের কি করা কর্তব্য?

প্রথমেই যুদ্ধের ভীতি থেকে অবশ্যই আমাদের মুক্ত হতে হবে। বর্তমান কালে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ে নিয়োজিত জাতিসমূহ মানুষ হত্যার প্রস্তুতির জন্যে প্রতি বছর তিরিশ হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ করছে, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে পাঁচশত সত্তর হাজার পাউণ্ড।

বিবেচনা করে দেখুন, এই বিপুল পরিমাণ অংকের টাকা যদি মানুষের কল্যাণের জন্যে ব্যয় হোত তাহলে কত উন্নতিই না সম্ভব ছিল। পৃথিবীর অর্ধেকের চেয়েও জনসংখ্যা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ভুগছে। এর কারণ এ নয় যে, প্রয়োজনবশতঃই তা হচ্ছে। আসল কারণ হোল সমৃদ্ধিশালী জাতিসমূহ দরিদ্র জাতিদের জীবনপদ্ধতির মান অর্জনে সাহায্য করা ও বাঁচিয়ে রাখার চেয়ে নিজেদের একে অপরকে হত্যা করাই পছন্দ করে। আমাদের বর্তমান মানসিকতা অব্যাহত থাকলে সমৃদ্ধিশালী জাতিদের সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যাবে না। শুধু একটা কাজই হবে যে, এর ফলে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে দরিদ্র জাতিসমূহের সমর্থন টাকার বিনময়ে বিক্রি হবে। এর পরিবর্তে শান্তি অর্জন ও তাদের সমর্থন আদায়ের জন্যে আমরাই বা কেন আমাদের অর্থ নিয়োগ করব না?

একটা ভয় রয়েছে—আর এর মূলে রয়েছে মালিকই হোক কিংবা শ্রমিকই হোক, যার অস্ত্র তৈরীর শিল্পে আগ্রহান্বিত এদের সকলের উস্কানি হোল যে, নিরস্ত্রীকরণ একটা ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে। অথচ এ সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার যোগ্যতা যাঁদের রয়েছে তাঁরা অনুরূপ মত পোষণ করেন না। পাঠকদের কাছে দুটো অত্যন্ত যথাযথ ও সতর্ক আলোচনার কথা বলতে চাই। সেগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে—যুক্তরাষ্ট্রের Chamber of Commerce-এর মুখপত্র 'দি ন্যাশনস বিজনেস'-এর ১৯৫৯ সনের অক্টোবর সংখ্যা—অপরটি হচ্ছে 'Think'-এর ১৯৬০ সনের জানুয়ারী সংখ্যায় সিনেটর হিউবার্ট. এইচ. হামফ্রের আলোচনা। এ দুটো নিষ্ঠাবন কর্তৃপক্ষই এ বিষয়ে একমত যে, দ্বিতীয় মহাসমর থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দেয় যে, যুদ্ধকালীন অর্থনীতির শান্তিকালীন অর্থনীতিতে সহজভাবেই রূপান্তর হতে পারে। অবশ্য এর জন্যে প্রয়োজন সুস্পষ্ট ও পুরোপুরিভাবে বাস্তব সতর্কতা। সুতরাং আমি বিশ্বাস করি যে, এমন ধরনের অস্পষ্ট তত্ত্বকে

BanglaBook.org

আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি—যার মতে আমরা শুধু পরস্পরকে হত্যা করার আয়োজনের মাধ্যমেই বেঁচে থাকতে পারি। বিশ্ব সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে কতকগুলো অর্থনৈতিক শর্ত পূরণ করতে হবে। একটা হোল পাশ্চাত্যের অত্যন্ত উন্নত এলাকার জনগণের জীবন ধারণের মান অনুন্নত দেশগুলোর জন্যেও সমপরিমাণে উন্নীত করা। যতক্ষণ না পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সকলের মধ্যে বিশেষ একটা অর্থনৈতিক সমতা অর্জন সম্ভবপর, ততক্ষণ দরিদ্র জাতিসমূহ উন্নত জাতিদের ঈর্ষা করবে এবং সমৃদ্ধিশালীরা কম সমৃদ্ধিশালীদের নিকট থেকে উচ্ছৃঙ্খল ক্রিয়াকলাপের ভয়ে আতংকিত থাকবে।

কিন্তু এটা এমন কোন কষ্টকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয় যার প্রয়োজন হতে পারে। শিল্পের জন্যে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামালের প্রয়োজন রয়েছে। আর এর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তৈল। সম্ভবতঃ ইউরেনিয়াম—যা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আজ আর তেমন কোন দরকারী বস্তু নয়—শিল্পের জন্যে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে কাজে লাগানো যেতে পারে। ঐ ধরনের কাঁচামালের ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকা কোন যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার নয়। আর কথাটা শুধু ব্যক্তিবিশেষের অথবা কোম্পানীর বেলায়ই নয় বরং বিভিন্ন রাষ্ট্রের বেলায়ও খাটে। কাঁচামাল ছাড়া কোন শিল্প চলতে পারে না। সুতরাং, এগুলো আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত এবং এসব বিভিন্ন জাতিসমূহকে দুটো ন্যায় বিচার ও যোগ্যতার নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত জাতির এ যোগ্যতার অভাব রয়েছে এদেরকে তা অর্জনের জন্যে সাহায্য করা উচিত।

নিরাপদ ও স্থায়ী পৃথিবীর যে রূপরেখা নিয়ে আমরা ভাবছি এর মধ্যে বর্তমানে যতখানি স্বাধীনতা আছে তার চেয়ে বেশী পরিমাণে নানা দিক থেকে স্বাধীনতা থাকবে। অবশ্য স্বাধীনতার সীমা নিয়ন্ত্রণের নতুন পদ্ধতিও এর সাথে থাকবে। কেননা বিশ্বসরকারের প্রতি আনুগত্য আদায় এবং বিশেষ কোন একটা জাতির কিংবা সমষ্টিগত জাতির যুদ্ধে মেতে উঠার প্রবৃত্তি দমন করার জন্যে এর প্রয়োজন রয়েছে। এ ধরনের বিধিনিষেধের আওতায় থাকবে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ভ্রমণের স্বাধীনতা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা। তা ছাড়া রয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের কথা। তরুণদের আর শিক্ষা দেওয়া উচিত নয় যে, বিদেশীদের হত্যার ব্যাপারে

BanglaBook.org

যে সমস্ত দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দক্ষতা দেখিয়ে তাদের জন্যে গর্ববোধ করা উচিত অথবা পডস্‌ন্যাপ-এর উক্তিটিও গ্রহণ করা উচিত নয়, যা হোল 'ওহে, বিদেশী জাতিসমূহ, বলতে দুঃখিত ওদের মত তোমরাও ক্ষতি সাধন করো।' ইতিহাস শিক্ষা দিতে হবে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং লড়াইয়ের কাহিনী যতটা সম্ভব বাদ দিয়ে যেতে হবে। আর জ্ঞানের অথবা শিল্পের আবিষ্কার অথবা দুঃসাহসী অভিযানের শান্তিপূর্ণ কার্যাবলীর উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বিশেষ কোন দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যদি আন্তর্জাতিক সরকারের বিরুদ্ধে অন্ধ দেশপ্রেম জাগ্রত করার প্রচেষ্টা করে তাহলে তা প্রতিরোধ করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করার শিক্ষা দেওয়া থেকে নিরস্ত রাখতে হবে। এ সমস্ত বিধিনিষেধ ছাড়াও সেখানে থাকবে বর্তমানের চেয়ে অধিক মাত্রায় শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা। শিক্ষকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ জনপ্রিয় না হলেও তা যদি যুদ্ধের বিপদের কারণ না হয় তাহলে তা সয়ে যেতে হবে। ইতিহাস ও সামাজিক বিষয়াদির শিক্ষার ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে মানুষের উপরে এবং আলাদা কোন দলগত জাতীয় সমস্যার নয়।

ব্যক্তি ও দল—উভয়ের প্রেরণার জন্যে দু'টো ভিন্নমুখী উৎস রয়েছে: প্রথমটি, সহযোগিতার আর অপরটি হোল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বিজ্ঞান বিষয়ক কারিগরি জ্ঞানের প্রতিটি উন্নতির ধাপ সহযোগিতার ইপ্সিত ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে। আমি বলতে চাইনে যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রেরণা হিসাবে পুরোপুরি-ভাবে মুছে যাক কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বুঝাতে চাই, তা ব্যাপকতর ক্ষয়-ক্ষতির জন্যে বিশেষ করে যুদ্ধে পরিণত হওয়ার কোন আকার যেন ধারণ না করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সমূহের মধ্যে এটাও থাকা চাই যার ফলে তরুণেরা বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা ও সমঝোতার ব্যাপারে সচেতন হয় এবং সমস্ত মানব জাতির স্বার্থকে সবার উর্ধ্বে মনে করার অভ্যাসে যেন অনুপ্রাণিত হয়। এমন ধরনের শিক্ষানীতির ফলে একটা সাধারণ বন্ধুত্বপূর্ণ অনুভূতির সৃষ্টি হবে এবং অধিকাংশ দেশসমূহে এখন যে ধরনের ঘৃণা ও হাতাশার অপপ্রচার চলছে তা হ্রাস পাবে।

এমন লোকও আছেন যাঁরা মনে করেন যে, যুদ্ধ ছাড়া মানব জীবন আকর্ষণহীন হয়ে পড়বে। স্বীকার করতেই হবে, বর্তমান পৃথিবীতে বহু

BanglaBook.org

মানুষ অসহনীয় গণ্ডীর মধ্যে কালাতিপাত করছে এবং এদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করে যে, মহাসমর বেধে গেলে যখন দূরবর্তী দেশসমূহে ওদেরকে পাঠানো হবে তখন নিজেদের পরিবেশের বাইরে অজানা বহু পথকে জেনে নেয়ার সুযোগ মিলবে এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা করা যাবে। তাছাড়া, অন্ততঃপক্ষে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর জীবনের স্পর্শ থেকে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যাবে। আমি মনে করি, এরকম পরিপ্রেক্ষিতে তরুণদের দুঃসাহসী এমনকি বিপজ্জনক অভিযানে নেমে পড়ার সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত। এ ধরনের দুরন্ত অভিযোগের জন্যে স্বভাবতঃ যা প্রয়োজন তা হোল শৃঙ্খলা-সহযোগিতা-দায়িত্ববোধ এমনকি আনুগত্যবোধ। আর এগুলোর যদি অভাব ঘটে তাহলে যে সমস্ত মানুষ যুদ্ধের সম্ভাবনায় মেতে উঠে তাদের যুদ্ধপ্রীতির ভিত্তিও শক্তিশালী হবে না।

দক্ষিণ ও উত্তর মেরু অঞ্চল, হিমালয় ও আন্দিজ পর্বতমালা প্রভৃতি স্থান আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক অভিযানে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ এদেরকে দেওয়া উচিত। আর কারো যদি এর চেয়েও বেশী দুঃসাহসী অভিযানের আকাঙ্খা থাকে তাহলে ওদেরকে মহাশূন্য অভিযানে উৎসাহিত করা উচিত। তাছাড়া এখন তো মহাশূন্য ভ্রমণের সম্ভাবনা মানুষের আয়ত্তের মধ্যেই প্রায় এসে গিয়েছে। অস্ত্রসজ্জার বোঝা কমিয়ে নেয়ার সাথে সাথে দুরন্ত তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে নিবৃত্ত করার জন্যে সরকারী খরচেই যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হবে। তবে বর্তমানের দুঃখ-দুর্দশা, আতঙ্ক ও মানব জাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনার পথে ঐসব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

যুদ্ধের আতঙ্ক বিদূরিত করা সম্ভব হলেও যুগসন্ধির সময়ে মানুষের চিন্তা ও উচ্ছ্বাস বিক্ষুব্ধ অতীতের দ্বারা প্রভাবান্বিত থাকবে। আর ঐ যুগসন্ধির সময়ে যুদ্ধের সম্ভাবনা শেষ হওয়ার সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত সুবিধা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মানসিকতার চিহ্ন তখনও থেকে যাবে এবং পুরাতন যুগের মানুষের মন অন্ততঃ নতুন পৃথিবী সৃষ্টি সম্ভাবনার কার্যক্রমে নিজেদেরকে সহজে মানিয়ে নিতে পারবে না। নতুন-ভাবে চিন্তাধারা পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টা যখন চলতে থাকবে তখন প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে স্বাধীনতার ক্ষেত্র কিছু পরিমাণে সীমিত করতে হবে।

এ সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব হতে পারে বলে আমার মনে হয় না।

BanglaBook.org

মানুষের প্রকৃতির দশভাগের নয় ভাগ পরিবেশের উপরে নির্ভরশীল এবং মাত্র দশমাংশ তার উত্তরাধিকার। আর যে অংশটা পরিবেশ থেকে উৎসারিত এর সম্পর্ক রয়েছে শিক্ষার সাথে। এমনকি যে অংশটা জন্ম-বিষয়ক তা'ও কোন কোন সময়ে বিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। যদি ধরে নিই যে, যুগসন্ধির কাল সাফল্যের সাথেই উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয়েছে তাহলে নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে পারি এর ফলে কোন্ ধরনের পৃথিবী আমরা আশা করছি।

শিল্পকলা সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ভূমিকা ঐ ধরনের পৃথিবীতে কি হবে? আমার মনে হয়, আমরা তখন আশা করতে পারবো—ভীতির বোঝা, ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ভয় এবং যুদ্ধের সুস্পষ্ট আশঙ্কা থেকে বিমুক্ত হওয়ার ফলে মানবসত্তা এমন এক স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতে পারবে যা আজ পর্যন্ত মানুষের অজানা। মানুষের আশা-ভরসা, কল্পনা সর্বসময়েই বাস্তবতার সীমারেখায় নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। মৃত্যুর পরে স্বর্গের আশায় দুঃখ-বেদনাকে অগ্রাহ্য করেছে। যেমন একজন নিগ্রো আধ্যাত্মিক বলেছেন—"ঘরে ফিরে গিয়ে স্রষ্টাকে আমি সমস্ত যাতনার কথা বলবো।" কিন্তু স্বর্গের আশায় অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে জীবন সুখময় না হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কেন মানুষের কল্পনা ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হবে না? এখন যে পৃথিবীর কল্পনা আমরা করছি যদি মানুষ সত্যিই তা চায়, তাহলে আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের কাঠামোর সীমারেখার মধ্যেই সৃজনশীল পৃথিবীর অবাধ সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। সাম্প্রতিককালে জ্ঞানের পরিধি এত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, তা সামান্য সংখ্যক সংখ্যালঘিষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এদের মধ্যে কম-সংখ্যক ব্যক্তিই রয়েছেন যাদের জ্ঞানকে কাব্যিক অনুভূতি ও মহাজাগতিক দূরদৃষ্টিতে পরিপূর্ণ করে তোলার স্পৃহা কিংবা ক্ষমতা রয়েছে। টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের পদ্ধতি দান্তের কাব্যে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। অবশ্য এর জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় দেড় হাজার বছর।

বিজ্ঞানকে আত্মস্থ করতে না পারার ব্যর্থতায় আমরা ভুগছি। কিন্তু কোন এক পৃথিবীর অধিকতর দুঃসাহসী শিক্ষা ব্যবস্থায় এ বদহজমকৃত জড়-পিণ্ডকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা হবে এবং আমাদের কাব্য এবং শিল্প-কলা প্রণোদিত হয়ে নতুন মহাকাব্যে নতুন পৃথিবীর স্বপ্নকে প্রতিফলিত

BanglaBook.org

করবে। মানুষের বিমুক্ত সত্তা পরিচালিত হবে নতুন দীপ্তি, নতুন সৌন্দর্য এবং নতুন উৎকর্ষের আবাহনে যা অতীত পৃথিবীর প্রতিবন্ধকতা ও হিংস্রতার ফলে ছিল অস্বাভাবিক রকম অসহায়। যদি বর্তমানের দুঃখ-কষ্টকে জয় করা যায় তাহলে মানুষ অতীতের চেয়ে অপরিমেয়ভাবে দীর্ঘতর ভবিষ্যতের আশা করতে পারবে। আর সে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে থাকবে স্বপ্নের নতুন দিগন্তের উন্মাদনা—থাকবে অবাধ কার্যক্রমে নির্ধারিত ও অনুপ্রাণিত দুর্বার আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। একটা শিশুর কৃতিত্বের উপযোগী পথের সূচনাই মাত্র মানুষ করেছে, কেননা জীববিদ্যার মতে মানুষ হচ্ছে সৃষ্ট জীবসমূহের শেষ প্রজাতি এবং এই প্রজাতি এখনো প্রায় শৈশবাবস্থায় রয়েছে। তার সফলতা কতখানি হবে এর সীমারেখা নির্ণয় করা অসম্ভব। ভবিতব্যই তা জানে। আমি আমার দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এমন একটি সুখী ও গৌরবময় পৃথিবী যেখানে মানুষের মনের প্রসারতা সম্ভবপর, যেখানে আশার শিখা থাকবে অনির্বাণ, যেখানে ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য সাধনের ভাঁওতা দেখিয়ে যা কিছু মহত্তর, যা কিছু কল্যাণকর তা আর বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিয়ে কোণঠাসা করা যাবে না। আমরা যদি সে পৃথিবীর আশায় সকলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই তাহলে এসব কিছুরই বাস্তব রূপায়ণ সম্ভবপর।

আর বর্তমান পৃথিবীর মানবসমাজকেই আজ স্থির করতে হবে সুন্দর পৃথিবীর এই ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, না অপরাধসমূহের প্রতিফল এই বর্তমান, আমাদের কাছে অধিকতর আবেদনশীল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG